বিপ্লবী অরবিন্দ

বিপ্লবী অরবিন্দ

শ্রীমতী অমিতা দেবী

কল্পনা সাহিত্য মন্দির
॥ কলিকাতা-৯ ॥

প্রকাশক :
হরেন্দ্র নাথ রায়
১৮, রজনী গুপ্ত রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

দাম : তিন টাকা।

ডাঃ কমলশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে—
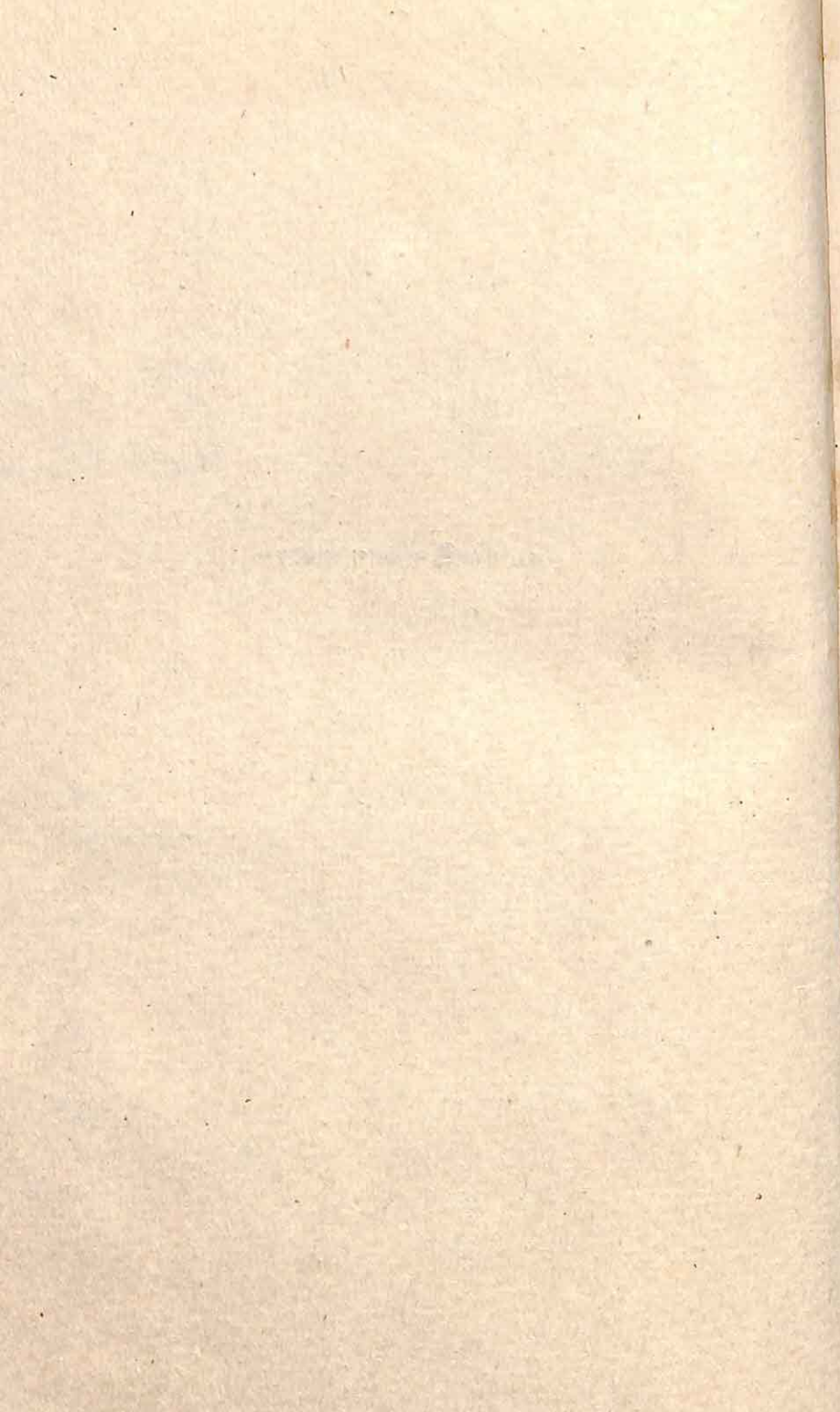
তখন ভোর হয় হয়। প্রায় পাঁচটা।

পুলিস ঘিরে ফেলেছে একটা বাড়ীর চতুর্দিক। ওরা গ্রেপ্তারের পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়েছে। এ তারই প্রস্তুতি পর্ব। এই পুলিস বাহিনী পরিচালনা করে এসেছে পুলিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট মিঃ ক্রেগান আরও একজন ইংরাজ অফিসার—মিঃ ক্লার্ক। ওদের হায়েনা চোখ এখন থেকেই সতর্ক ঃ যেন এই বাড়ী হতে কেউ বের হয়ে আসতে না পারে, পালিয়ে না যায়। সাধ্য কি? ব্রিটিশ পুলিস ব্যূহ ভেদ করে একটি মক্ষিকাও যেন উড়ে না পালায় এমন সতকর্তা ওদের।

কিন্তু কেন এই সতকর্তা? কাকে গ্রেপ্তার কোরবার জন্য ওদের এমন নিখুঁত ব্যূহ রচনা? কে সে?

আট চল্লিশ নম্বর গ্রে স্ট্রিটের বাড়ী।

গ্রেপ্তার করতে এসেছে ব্রিটিশ পুলিস বাহিনী এই বাড়ীরই বিশেষ একজনকে।

এবার পুলিশ বাহিনীর একটা অংশ এগিয়ে চলে বাড়িটার উদ্দেশ্যে।

দাদা, ওঠো, ওঠো, বাড়িতে পুলিস এসেছে।

ভগিনীর আহ্বান শোনা গেল দাদার উদ্দেশ্যে। দাদা তখন বোধ হয় ঘুমুচ্ছেন। আর ঘুমোবেনই বা না কেন? এমন কাক-ডাকা-ভোরে ঘুম থেকে ওঠার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? পুলিস

বাহিনী যে হঠাৎ তার উপর এত সদয় হয়ে উঠবে, রাত কেটে ফর্সা হওয়ার আগেই হাজির হবে সে কথা ভাববেনই বা কেমন করে?

বোনের ডাকে ঘুম ভেঙে গেছে তখন দাদার।

ব্যাপারটা কি জানতে চাইলেন?

কিন্তু ব্যাপার আর জানা হল না। ভাল করে সব কিছু তখনও জানাই হয়নি, ঘুমের আমেজটা কাটিয়ে নিতেও তো কয়েকটা মুহূর্তের প্রয়োজন—অথচ সে সময় তিনি পেলেন না। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল পুলিস বাহিনীর সেই খণ্ডাংশ বাড়ীর ভিতরে।

এগিয়ে এলো মিঃ ক্লার্ক।

ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছে সে। একী দৈন্য দশা! অবিশ্বাস্য!

ঘরের মেঝেয় শুধুমাত্র একটা মাদুর পেতে একটা লোক শুয়ে রয়েছে। এই লোকটিকেই কি আজ গ্রেপ্তার করতে এসেছে?

একটা সন্দেহ, একটা দ্বিধা জাগে মিঃ ক্লার্কের মনে। অথচ এখানে অভিযান চালনা করার আগেই সে তো নিশ্চিত খবর পেয়েছে তাদেরই গোয়েন্দা দপ্তর হ'তে যার বিরুদ্ধে এমন সশস্ত্র অভিযান চালাবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সে লোকটি এই আটচল্লিশ নম্বর বাড়িতেই আছে। তবে কি এ অন্য কেউ? তার মন সন্দেহ দোলায় তখন দোদুল্যমান।

সন্দেহ নিরসনের আশায় জিজ্ঞেস করল বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত মিঃ ক্লার্ক।

আমি অরবিন্দ ঘোষকে খুঁজছি।

আমিই অরবিন্দ ঘোষ।

চমকে উঠল পুলিস অফিসার।

এ কোন অবিশ্বাস্য কথা? এ-ই অরবিন্দ ঘোষ!

দেখলে মনে একবারও সন্দেহ জাগে না যে দীর্ঘ নয় বছর ইঁনিই কাটিয়ে এসেছেন বিলেতে। চাল-চলনে, খানা-পিনায় যিনি

পুরোপুরি সাহেব, যিনি ভালো করে বাংলা বলতে পারেন না পর্যন্ত তার এই দৈন্যদশা মিঃ ক্লার্কের কল্পনারও বাইরে। ঘরে বিছানা-বালিশ নেই, তক্তপোশ তো দূরের কথা।

কৃচ্ছসাধনার একটা স্পষ্ট স্বাক্ষর যেন ঘরের সর্বত্র।

অরবিন্দের দিকে তাকিয়ে রইল মিঃ ক্লার্ক তারপর বলল, I am ashamed of yon.

নিরুত্তর অরবিন্দ। মুখে হাসি। ভোগ বিরতির মূল্য বোঝার সাধ্য তোমার নেই ব্রিটিশ কর্মচারী।

এমন ঘরে খানা তল্লাসি চালানো সময়ের অপব্যয় মাত্র।

তবু কর্তব্য করতেই হবে।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল পুলিস বাহিনী।

শুরু হল সার্চ।

কিন্তু কোথায় কি ?

কোন আপত্তিকর জিনিস কোথাও নেই। তবু সতর্ক দৃষ্টি নিয়েই ওরা শুরু করল খানা তল্লাসি। সব জিনিস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার একটা প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। অন্ততঃ ব্রিটিশ পুলিসের এই রকমই একটা বিশ্বাস।

হঠাৎ নজর পড়ল একজন পুলিসের। একতাড়া কাগজ। ওগুলো কি ? নিশ্চয়ই বিপ্লবীদের কাছে লেখা চিঠি পত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়। ওগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ওগুলো তচ্‌নচ্‌ করে ফেলল পুলিস বাহিনী।

কিন্তু হায়রে মূঢ়! ওগুলো অরবিন্দেরই লেখা কবিতার পাণ্ডুলিপি মাত্র।

সেগুলোই তোমরা স্পর্দ্ধা ভরে ছড়ালে, ছিটালে; সঙ্গেও নিয়ে গেলে।

অপদার্থতার পরিচয় তোমরা আর কি দেবে ব্রিটিশ পুলিস ?

সার্চ চলেছে পুরো দমে। এ-ঘর ও-ঘর। এখানে-সেখানে—সর্বত্র।

অরবিন্দের ঘর হ'তে পাওয়া গেল একটা কাগজের বাক্সে মাটি।

ওটা কী?

চমকে উঠেছে মিঃ ক্লার্ক। তাহলে এই বস্তুর সন্ধান পাওয়ার জন্যই কি তাদের এমন খানা তল্লাসি চালানো? যেন জোরদার হয়ে ওঠে অরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

সরাসরি জিজ্ঞেস করে মিঃ ক্লার্ক অরবিন্দকে।

এগুলো কি বোমার মশলা?

তার চেয়েও মারাত্মক।

আতঙ্কিত মিঃ ক্লার্ক। আঁতকে উঠে একটু নিম্ন স্বরেই আবার জানতে চায়, কী?

দক্ষিণেশ্বরের মাটি।

দক্ষিণেশ্বরের মাটি? তাকে বোমার চেয়েও মারাত্মক বলার মানে?

অরবিন্দ হাসলেন।

হ্যাঁ, দক্ষিণেশ্বরেরই মাটি—রামকৃষ্ণ পরমহংসের চরণ-ছোঁয়া মাটি। এতো সাধারণ মাটি নয়—এ যে পবিত্র তীর্থ-রেণু। আর বোমার চেয়ে মারাত্মক তো নিশ্চয়ই। দক্ষিণেশ্বরের প্রতি ধূলিকণাই এক একটি বোমা।

মিঃ ক্লার্ক এবার নিশ্চিন্ত। তাহলে ওগুলো তেমন মারাত্মক নয়।

আবার হাসলেন অরবিন্দ মিঃ ক্লার্কের এমন নিশ্চিন্ততা দেখে।

তাই প্রশ্ন করলেন, তার সব চেয়ে বড় বোমাটার নাম শোনেন নি?

অবাক মিঃ ক্লার্ক। কৈ তার তো তেমন কিছু মনে পড়ছে না।

সে বোমাটার নামই স্বামী বিবেকানন্দ। স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করলেন অরবিন্দ।

পুলিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট মিঃ ক্রেগান এবার হুকুম দিলেন। আসামীর হাতে হাত-কড়া ও কোমরে দড়ি পরাও।

তা-ই হল।

অরবিন্দের হাতে হাত-কড়ি কোমরে দড়ি পরানো হল।

অরবিন্দ কিন্তু নির্বিকার এ ব্যাপারে।

সাধারণ আসামীর উর্দ্ধে অরবিন্দকে স্থান দিতে পারছেন না ক্রেগান।

আর তারপর?

তারপর তোমরা সব আসামীর ক্ষেত্রে যা করে থাক।

বিচার!

বিচারের নামে প্রহসন।

অত্যাচারে আর উৎপীড়নে জবানবন্দী নেওয়ার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা।

দোষী প্রমাণ করতে পার আর না পার—রায় তোমাদের অনুকূলেই। অনুকূলে তো হবেই। আসলে বিচারকও তো তোমাদেরই নির্দিষ্ট, রায়ও তোমাদের নির্দ্ধারিত।

তাই যখন তোমরা দেখলে ৪ঠা মে কমিশনারের সামনে অরবিন্দ কোন কারণেই কোন কথা বলতে চাইলেন না, তখন তোমরা ৫ই মে ম্যাজিষ্ট্রেট থর্ণ হিলের এজলাসে নিয়ে এলে অরবিন্দকে।

সেখান থেকে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে।

কী চমৎকার বিচার ব্যবস্থা তোমাদের!

বিচার হল না, রায় দেওয়া হলে তোমাদেরই পক্ষে—তোমাদের ইচ্ছামত। নির্দেশ অনুযায়ী।

নির্জন কারাবাসের ব্যবস্থা হল অরবিন্দের জন্য।

কিন্তু এতো কারাগার নয়—এ যে নব জন্মের সূতিকাগার।

অরবিন্দের জীবনে কারাগার অভিসম্পাতের তীব্র জ্বালা নিয়ে এল না, এল আশীর্বাদের অমৃত ধারা নিয়ে।

অরবিন্দ ঘোষ শুধু বিপ্লবী নন—তিনি ঋষি। ঋষি অরবিন্দ।

১৮৭২ সালের পনেরই আগষ্ট।

জন্মগ্রহণ করলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। জন্ম কোলকাতারই একটি অখ্যাত পল্লীতে।

পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ। মাতা স্বর্ণলতা দেবী।

কোন্নগরের ঘোষ পরিবার সর্বজন বিদিত।

এই সর্বজন পরিচিত, সর্বজন বিদিত বিখ্যাত ঘোষ বংশেরই ছেলে কৃষ্ণধন ঘোষ।

তখন আমরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ধর্ম ধর্ম করেই সমাজপতিরা ব্যস্ত, অথচ ধর্মের নামে প্রকারান্তরে তারা যে অধর্মাচারণকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন দিনের পর দিন তা সেকালীন নীতিবাগীশদের বোধেরও বাইরে ছিল। তা না হলে সাগর পারে গেলে হিন্দু ধর্মচ্যুতি ঘটে, শব ব্যবচ্ছেদে ধর্ম একেবারে পণ্ড—এমন ভ্রান্ত বিশ্বাস সেই সমাজ-পতিদের মাথায় ভূত হয়ে চেপে বসবেই বা কেন? কেনই বা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ণরত ছাত্রেরা তাদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াবে?

সমাজপতি আর নীতিবাগীশদের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করেই কৃষ্ণধন ঘোষ কালাপানি পাড়ি দিলেন। উদ্দেশ্য চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ। অতএব কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দুসমাজ তার দিকে ভ্রূকুটি হানল কিনা, সমাজপতিরা তাদের স্বার্থসৃষ্ট বিধি নিষেধ আর শাসন অনুশাসনের জালে তাকে ঘিরে ফেলল কিনা তাতে তার বয়েই গেল। ওসব তোয়াক্কা করেন না তিনি। তাছাড়া মনে মনে ভাবতেন বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে ফিরলে সমাজপতিরা কি আর তাকে ঠেলতে পারবে?

তাই অযথা আর চিন্তা করে লাভ নেই।

তিনি বিলেত গেলেন।

এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াশুনা করলেন। অবশেষে সসম্মানে এম. ডি. উপাধি নিয়ে ফিরে এলেন দেশে।

কিন্তু একী শুনছেন তিনি?

অবাক মানলেন কৃষ্ণধন ঘোষ।

সমাজপতিদের স্পষ্ট বক্তব্য ঃ

কৃষ্ণধনের জাত গেছে। ম্লেচ্ছদেশে এতকাল পড়াশুনা করার পরেও কি আর হিন্দুর হিন্দুত্ব তিলমাত্র বজায় থাকে—না থাকা সম্ভব?

অতএব বিধান দিলেন সমাজপতিরা।

কৃষ্ণধনের প্রায়শ্চিত্ত করা আশু প্রয়োজন।

সমস্ত অন্তরাত্মা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল কৃষ্ণধনের।

না, প্রায়শ্চিত্ত তিনি করবেন না। তিনি এমন কোন অপরাধ করেন নি যে আজ প্রায়শ্চিত্ত করার প্রশ্ন উঠতে পারে?

জাত কি এতই ঠুন্‌কো। যে জাতের নামে এমন বজ্জাতি তিনি মেনে নেবেন। সাগর পার হলেই যদি জাত যায় তবে সে জাত যাওয়াই ভাল।

ভিত্তিহীন অভিযোগ আমি মানি না—মানব না। সমাজপতিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন কৃষ্ণধন ঘোষ।

সুতরাং সমাজপতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ছাড়া উপায়ন্তরও নেই। তাই মুখোমুখি ওদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্যই মনে প্রাণে প্রস্তুত হলে ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ।

সমাজপতিদের বিষদৃষ্টিতে পড়লেন কৃষ্ণধন।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের দল দোর্দণ্ড প্রতাপে হুঙ্কার ছাড়লেন।

কৃষ্ণধন বিধর্মী, ম্লেচ্ছ,—ঘোষ বংশের কলঙ্ক। তাকে আজ হতে আমরা 'একঘরে' করলাম।

নিরুপায় গ্রামবাসী।

বলির পাঁঠা ওরা—সমাজপতিদের হাড়কাঠে সবসময় যেন গলা পাতাই আছে। অতএব কোন দ্বিধা নয়। সমর্থন জানাতেই হবে।

ঠিক—ঠিক।

কৃষ্ণধন বুঝলেন আর কোন্নগরের উপর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করতে তার মন সাঁয় দিল না।

পৈতৃক গ্রাম কোন্নগর ছেড়ে যেতেই হবে।

যখন একবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিরোধিতার তখন মাথা নীচু করে সেখানে বিরোধিতার সঙ্গে আপোসে রফা করা অযৌক্তিক।

অতএব চল কোলকাতা।

নামমাত্র মূল্যে বাড়ীঘর বিক্রি করে সেলাম জানালেন নিজ গ্রামকে। চলে এলেন কোলকাতায়। এ-ই ভাল হল।

অন্ততঃ সমাজপতিদের আগ বাড়িয়ে শাসন তো আর নেই।

কিন্তু বিচিত্র মানুষ এই খ্যাতনামা সিভিল সার্জন ডাঃ ঘোষ।

পোশাকে, পরিচ্ছদে, চলনে-বলনে, আচার-আচরণে, খানা-পিনায় পুরো দস্তর সাহেব হয়েও অধিকাংশ সরকারী কর্মচারীদের মত মাতৃভূমির অধিবাসীদের প্রতি উন্নাসিক তিনি নন। বরং ভালবাসতেন জন্মভূমিকে, ভালবাসতেন স্বদেশের দরিদ্র অধিবাসীদের। ওদের দুঃখ মোচন করাই তো ছিল তাঁর জীবনের একটা বিরাট ব্রত।

পিতার এই সদ্‌গুণ অরবিন্দ পেলেন উত্তরাধিকারসূত্রেই যেন।

অরবিন্দ কৃষ্ণধন ঘোষের তৃতীয় পুত্র।

জ্যেষ্ঠ বিনয় ভূষণ, দ্বিতীয়পুত্র মনোমোহন, আর কনিষ্ঠ বারীন্দ্র কুমার।

আর চার ভাইয়ের একটি মাত্র বোন সরোজিনী।

ডাঃ ঘোষের বিশ্বাস, ইংরাজদের স্কুল ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নয়।

শুধু মাত্র পুঁথিগত বিদ্যা আহরণই তো আর শিক্ষার্জনের মাপ কাঠি নয়। সময় নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা নিষ্ঠা, আচরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এগুলোও তো শিক্ষণীয়—তা না হলে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অতএব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দান ব্যাপারে কৃষ্ণধন ঘোষ বরাবরই ইউরোপীয়ান স্কুলই পছন্দ করতেন।

বিনয় ভূষণ ও মনোমোহন দার্জিলিং-এর লরেটো কন্‌ভেণ্ট স্কুলের ছাত্র।

অরবিন্দের বয়স তখন মাত্র পাঁচ।

তা হোক! তবু স্থির সঙ্কল্প নিলেন ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ তাকেও ঐ লরেটো কনভেণ্ট স্কুলেই ভর্তি করে দেবেন।

অবশেষে একদিন বিনয় ভূষণ আর মনোমোহন দুই দাদার সঙ্গে অরবিন্দ এলেন ঐ স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্যে! ভর্তি হলেনও।

কিন্তু একী!

সেইসব ইউরোপীয়ান ছাত্র ও অধ্যাপকরাই যারা ভারতীয়দের নেটিভ ভেবে অবজ্ঞা মেশানো করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারাই কিন্তু আজ বিস্ময় বিমুগ্ধ অরবিন্দের মেধার পরিচয় পেয়ে। অরবিন্দের প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য ও স্বভাবের মাধুর্য দেখে আজ আর তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার জো নেই।

বিজাতীয় আবেষ্টনী।

কিন্তু তাতে অরবিন্দের কি আসে যায়? এ আবেষ্টনীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তাকে খুব বেশী বেগ পেতে হল না। সম্পূর্ণ বিজাতীয় পরিবেশেও অরবিন্দ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলেন আপন সৌরভে।

তবু এদেশে ছেলেদের ইউরোপিয়ান কায়দায় শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সফলতা লক্ষ্য করে তৃপ্ত হতে পারলেন না ডাঃ ঘোষ।

বিলেত যাওয়ার সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত নিলেন।

সাত বছরের অরবিন্দ, বিনয় ভূষণ, মনোমোহন কে সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে বিলেত যাত্রা করলেন ডাঃ কৃষ্ণধন।

জাহাজ তখনও লক্ষ্যে পৌঁছায়নি।

জন্ম হল জাহাজেই—উত্তাল সমুদ্রের বুকেই কনিষ্ঠ পুত্র বারীন্দ্র কুমারের।

হয়তো ভগবানের এ অভিপ্রেত!

তাই জন্মলগ্নের উত্তালতা উদ্দামতা যা ছিল সাগরের বুকে—সেই উত্তালতা উদ্দামতাই তো শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হল বারীন্দ্র কুমারের জীবনে। বারীন্দ্র কুমারের বিপ্লবী জীবন এ ছাড়া আর কি?

পৌঁছালেন ইংলণ্ডে কৃষ্ণধন ঘোষ সপরিবারে।

স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের লেখাপড়া ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেই দেশে ফিরলেন ডাঃ ঘোষ। তার কি ইংলণ্ডে পড়ে থাকলে চলে? চিকিৎসার মাধ্যমে যে সেবাব্রত উদ্‌যাপন তিনি করেছেন তা মাঝপথে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না। দেওয়া সম্ভব নয়।

দিন কাটে।

স্ত্রী স্বর্ণলতা দেবী চঞ্চল হয়ে উঠলেন দেশে ফিরে আসার জন্য। শিশুপুত্র বারীন্দ্র কুমার আর মেয়ে সরোজিনীকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ফিরে এলেনও।

আর ওরা তিনজন ?

বিনয় ভূষণ, মনোমোহন আর অরবিন্দ ?

থেকে গেলেন বিলেতেই। ম্যাঞ্চেষ্টারে ড ইড পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। বিলেতে থেকেই লেখাপড়া শিখতে হবে তাদের।

এই ড ইড পরিবারের সঙ্গে ডাঃ ঘোষের ছিল প্রীতি মধুর সম্পর্ক। সেই বাড়ীতে থেকেই ওরা তিনভাই লেখাপড়া চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অরবিন্দ ভর্তি হলেন ম্যাঞ্চেষ্টার গ্রামার স্কুলে।

দেখতে দেখতে পাঁচ পাঁচটা বছর কেটে গেল।

শিখে নিলেন ইংরাজী, আয়ত্ব করলেন ফরাসী ভাষা। চেষ্টায় কেষ্ট মেলে। তাই চেষ্টা করেই অরবিন্দ আরও দুটি ভাষা অল্পবয়সেই আয়ত্ব করলেন—ইতালীয় ভাষা আর জার্মান ভাষা।

কিন্তু বেশী দিন আর ম্যাঞ্চেস্টারে থাকা হল না।

ড ইড পরিবারের সকলেই চলে গেলেন ম্যাঞ্চেস্টার ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায়। অতএব ম্যাঞ্চেষ্টারের শান্তি ও আনন্দের হাট ভেঙে গেল।

তা ছাড়া আর কি ?

অরবিন্দ এই পরিবারেরই আত্মীয় অক্রয়েড পরিবারে এত বেশী যাওয়া আসা করতেন যে তার তো তখন নতুন নামকরণ হয়েছিল—অরবিন্দ অক্রয়েড ঘোষ।

আজ যখন ম্যাঞ্চেষ্টারে পরিচিত জন কেউ রইল না তখন কেনই বা বৃথা পড়ে থাকা ম্যাঞ্চেস্টারে।

একরকম বাধ্য হয়েই তারা চলে এলেন ম্যাঞ্চেস্টার ছেড়ে লণ্ডনে।

এবার আর ম্যাঞ্চেষ্টার গ্রামার স্কুল নয়—এবারে লণ্ডনের সেন্টপলস্ স্কুল।

কিন্তু প্রতিভা আর সুমধুর চরিত্র গুণ কি আর স্থান ভেদে পরিবর্তিত হয় ?

অরবিন্দের অতুলনীয় প্রতিভা মুগ্ধ কোরল এখানেও সকলকেই—তার চরিত্র মাধুর্যই টেনে আনল সকলকে তার কাছাকাছি, পাশাপাশি।

সেণ্ট পলসেও পাঁচটা বছর কাটল।

সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন ম্যাটি কুলেশন পরীক্ষায়। বৃত্তিও পেলেন। যার মূল্য চল্লিশ পাউণ্ড। একী কম কথা!

তারপর কলেজ।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কিংস কলেজে ভর্তি হলেন অরবিন্দ।

দু' দুটো বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে।

এবারেও সম্মান—এবারেও কৃতিত্ব।

ট্রাইপস পেলেন অরবিন্দ।

খবর যথা সময়েই পৌঁছাল কৃষ্ণধনের কাছে।

পুত্র গৌরবে পিতার মুখ তখন উজ্জ্বল। তাছাড়া অরবিন্দ যে তার বড় আদরের।

চিঠি লিখলেন অরবিন্দকে :

আমার ইচ্ছা তুমি সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও।

কৃষ্ণধন স্বপ্ন দেখেন, তার অরবিন্দ আই. সি. এস. পাশ করেছেন। একটা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছেন।

পিতার চিঠি পেয়ে মনস্থির করে ফেললেন অরবিন্দ।

আই. সি. এস. পড়বেন তিনি।

পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হল এবার।

এল আঠার শ' নব্বই সাল।

অরবিন্দের বয়স তখন মাত্র আঠারো।

আই. সি. এস. পরীক্ষায় বসলেন আঠারো বছরের ভারতীয় তরুণ অরবিন্দ ঘোষ।

পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল যথাসময়ে।

অরবিন্দ ঘোষ চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন আই. সি. এস. পরীক্ষায়। গ্রীক ও লাটিনে তিনি পেলেন রেকর্ড মার্ক।

সেদিনই বুঝতে পেরেছিল, ভারতীয় তরুণ অরবিন্দ কী অসাধারণ প্রতিভারই না অধিকারী!

ভারত গৌরব অরবিন্দ।

বিদেশীরা সেদিন বুঝেছিল, যাদের নেটিভ, কালা আদমী ভেবে এতকাল অবজ্ঞার চোখে তাকাচ্ছিল তারাও প্রতিভাধর, নতিস্বীকার করেছিল সেদিন ওরা অরবিন্দের কাছে।

কিন্তু একী হল! বিদেশী ভাষা শিখতে গিয়ে তিনি যে নিজের মাতৃভাষা প্রায় ভুলে গেলেন! ইংরাজী ভাষায়, লাটিন ভাষায়, গ্রীক ভাষায়, ফরাসী ভাষায় যিনি পণ্ডিত হয়ে উঠলেন তিনি কিনা তার মাতৃভাষায় অত্যন্ত কাঁচা। এ কল্পনারও বাইরে। কিন্তু এমনই হয়। ছোট্ট বয়স হতে একটা ভিন্ন পরিবেশে এসে মাতৃভাষা চর্চার সুযোগ আর এল কৈ?

ড ইড পরিবারের অভিভাবকত্বের মধ্যেই হোক্ বা বন্ধুবান্ধব-ছাত্রমহলই হোক সর্বত্রই তো বিদেশী ভাষার চর্চা—বিদেশী ভাষার অনুশীলন। একেবারে প্রারম্ভেও দার্জিলিং-এর লরেটো স্কুল।

সুতরাং নতুন করে মাতৃভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে গিয়ে—কিছু কিছু বাংলা ভাষা শিখলেনও।

কিন্তু আপাততঃ ঐ পর্যন্ত !

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য লাভ করলেন অরবিন্দ।

কিন্তু এখনও অনেক বাকী।

এই ডিগ্রী পেতে হলে অন্ততঃ দু'বছর তাকে শিক্ষানবিস থাকতে হবে।

আর তারপর ?

তারপর শেষ পরীক্ষা—ঘোড়ায়-চড়ার পরীক্ষা।

শিক্ষানবিস রইলেন অরবিন্দ। শেষও হল দুটো বছর কালের অগ্রগতিতে।

কিন্তু বিচিত্র মনের গতি।

কখন সে গতি বদল হয় কে বলতে পারে ?

অরবিন্দের কানে বোধ হয় তখন দিন রাত গুঞ্জিত হচ্ছিল একটি কথাই।

অনহংবাদী হয়ে দেশসেবা।

ইংরাজের গোলাম হয়ে জীবন কাটানোর জন্য তার জন্ম নয়। পরাধীন দেশমাতার আহ্বান শুনেছেন, শুনেছেন পরাধীন দেশমাতার আর্তক্রন্দন। মায়ের এ অশ্রুমোচনের দায় যে তারও। তাকেও নিতে হবে এ দায়িত্ব।

পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিন।

পথে বের হয়েছেন অরবিন্দ।

পথ আর ফুরোয় না। চলার শক্তিও যেন তার নেই।

শুধু মনে মনে ভাবছেন ক্রমাগত, অনহংবাদী হয়ে দেশসেবা।

উত্তীর্ণ হয়ে গেল নির্দ্ধারিত সময়।

ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষা দেওয়ার নির্দিষ্ট স্থানে আর হাজির হতে

পারলেন না অরবিন্দ ? আই. সি. এস. পরীক্ষায় ফোর্থ হওয়া সত্বেও ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষায় হাজির হতে না পারায় অরবিন্দের ফলাফল নাকচ হয়ে গেল।

তা হোক।

দুঃখ নেই অরবিন্দের সেজন্য।

শুধুমাত্র পিতার ইচ্ছাটুকু পূরণ করার জন্যই তো তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় বসেছিলেন, কিন্তু যখন সাফল্য একেবারে দ্বারে এসে পৌঁছাল তখনই ভয় পেলেন তিনি, তাহলে কি তিনি ঢালাও সুখ, কার্পেট বিছানো জীবন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের বিনিময়ে একটি পরজাতির গোলাম বনবেন ? না, তা হয় না, হতে পারে না। তিনি জানতেন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে হয়তো মোহ-মুক্তি সময় সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াবে, তাছাড়া পিতার ইচ্ছার বাইরে প্রতিবাদ যদি জানাতে না পারেন ? অতএব সব চেয়ে ভাল কথা, পরীক্ষায় হাজিরা তিনি দেবেন না।

তিনি যে শুনেছেন অলৌকিক শক্তির আহ্বান !

দেশ তোমার কাছে এ-ই দাবি করে অরবিন্দ।

নাই বা হলেন আই. সি. এস.।

দুঃখের সাধনা করতে তো ভয় নেই অরবিন্দের। নেই কোন দ্বিধা।

কেনই বা থাকবে? কখনও ভাগ্য বিড়ম্বনায়, কখনও বা স্বেচ্ছায় তাকে তো ঘর করতে হয়েছে দুঃখের সঙ্গে। দুঃখের কাছে হার মেনে তো পরাণ কভু হারবে না।

বিলেতে থাকতেই হয়েছে দুঃখের সঙ্গে ঘর করার হাতেখড়ি।

ডাঃ কৃষ্ণধন চিরকালই উদাসীন। অতএব হয়তো বা টাকা পাঠাবার কথা আর তার মনেই নেই। তাছাড়া টাকা পাঠালেই সব সময় সময় মতো টাকা পৌঁছাবে তেমন গ্যারাণ্টিও তো ছিল না। তাই টাকা পয়সা সময় মতো পেতেন না বিনয়ভূষণ, মনোমোহন বা অরবিন্দ। কখনো বা এমনও হয়েছে ছেলেদের টাকা পাঠাবার জন্য সঙ্কল্প নেওয়ার পরও আর সে টাকা তিনি পাঠাতে পারলেন না। হয়তো বা দুঃখের ফিরিস্তি নিয়ে হাজির হয়েছে পরিচিত-অপরিচিত কেউ। তার দুঃখের কথা শুনতে শুনতে অভিভূত কৃষ্ণধন তখন বেমালুম ভুলে গেছেন—ছেলের জন্যে রক্ষিত টাকাগুলোই তিনি তুলে দিয়েছেন তার হাতে। তারপর যখন তার মনে পড়েছে এ টাকা ছেলেদের পাঠাবার জন্যেই রেখেছিলেন তখন ভেবেছেন :

কুচপরোয়া নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই টাকা হাতে এসে পড়বে ছেলেদের পাঠিয়ে দেবো।

কিন্তু সেই কয়েকদিন এল অনেক দেরী করে।

তারপর তিনি টাকা পাঠালেন—সেই টাকা বিলেত পৌঁছে ছেলেদের হাতে পৌঁছাতেও হয়ে গেল অনেক দেরী।

ছেলেদের একমাত্র ভরসা ঋণ অথবা উপোস।

কিন্তু বিদেশ-বিভুঁয়ে কি আর সব সময় ঋণ মেলে না মেলা সম্ভব ?

অরবিন্দ কিন্তু এসব দিকে খেয়াল করতেন না।

খাওয়া হয়েছে কি হয় নি সে কথা সব সময় মনে করবার জন্য তার বয়েই গেছে। পাঠাগারের পুস্তকরাজি তখন তার অবলম্বন হত। মনের ক্ষুধা মিটাতে বসে দৈহিক ক্ষুধা মেটানোর কথা তিনি ভুলে যেতেন, প্রয়োজনীয়তাও বোধ করতেন না বিন্দুমাত্র।

তিনি যে সাধক। সাধনাই যে তার একমাত্র লক্ষ্য। এ সাধনা জ্ঞানার্জনের সাধনা—এখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটা না-মেটার প্রশ্ন অবান্তর।

আই. সি. এস. হ'তে পারলেন না অরবিন্দ।

ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষায় হাজিরা না দেওয়ার অজুহাতে।

চমৎকার ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকার।

আসল কারণ তো অন্য রকম। আসলে ভারতীয় ছাত্রদের সভায় অরবিন্দের রাজনৈতিক বক্তৃতা তোমাদের ভাল লাগেনি। তাই শাসক গোষ্ঠী তোমরা—তোমাদের ক্ষমতা ও শক্তির পরিচয় না দিলে কি চলে ?

তাই তোমরা শাসকগোষ্ঠী তুচ্ছ ঘোড়ায়-চড়ার অজুহাতে নাকচ করে দিলে অরবিন্দের পরীক্ষার সম্পূর্ণ ফলটাকেই।

বারীন্দ্রকুমার 'আমার আত্মকথা' গ্রন্থে লিখেছিলেন সে কথা।

"সেখানে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের এক আলোচনা সভা ছিল, তার নাম ছিল 'মজলিস'। এই সভায় গরম গরম রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ায় অরবিন্দ সেই বয়সেই ইংরেজ সরকারের 'সুনজরে' পড়েন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন সেখানে অরবিন্দের সমসাময়িক।
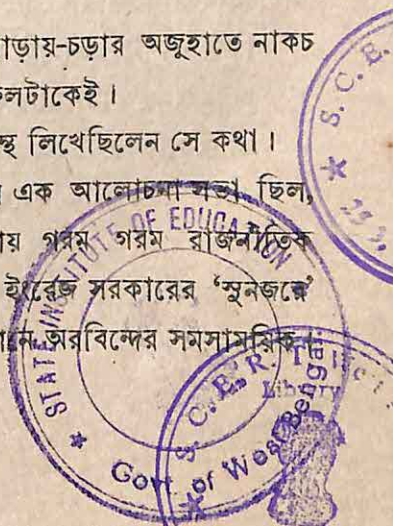
আই. সি. এস. পরীক্ষায় বেশ সম্মানের সঙ্গে পাস করেও তুচ্ছ ঘোড়ায়-চড়ার অজুহাতে যে তাঁকে অকৃতকার্য বিবেচনা করা হল তার কারণ খুব সম্ভব ইংরেজ সরকারের সেই সুনজর।”

কি জবাব দেবে ইংরেজ সরকার?

মিথ্যা কথা!

সত্যি তোমাদের বাহাদুরি আছে।

একটা মনগড়া গল্প ফেঁদে বসার মতো জুড়ির অভাব তোমাদের নেই।

তাই তোমরা বলে বসলে ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার জন্যই অরবিন্দ আই. সি, এস হতে পারলেন না। কী সুন্দর তোমাদের ছলনা। তিনি যে পরীক্ষা দিতে হাজির হলেন না সে কথা বলার মত সৎসাহস পর্যন্ত তোমাদের নেই।

সাক্ষী সেকালীন প্রচারিত আমাদের সংবাদ পত্রগুলোই।

অথচ ভাবতো একবার চারুচন্দ্র দত্তের বোম্বাইয়ের বাসার কথা।

সেই কাহিনী শুনলেই তো প্রমাণ পাওয়া যাবে অরবিন্দ সম্পর্কে তোমরা যে প্রচার চালিয়েছ তা কতখানি ভিত্তিহীন।

বোম্বাইয়ের একটা ছোট্ট শহর। ঠানা।

ঠানার একটা বাড়িতে তখন চারুচন্দ্র থাকতেন।

চারুচন্দ্রের বাড়িতে হাজির হয়েছেন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব। সবারই ইচ্ছা ছিল বাইরে বেরুবেন।

কিন্তু কী নিদারুণ বৃষ্টি! বাইরে বের হয় সাধ্য কার?

অথচ সময় কাটানোও দায়।

হঠাৎ পরিকল্পনা হল সময় কাটানোর।

ছোট্ট একটা রাইফেলও এল।

দূরে বসিয়ে দেওয়া হল একটি দেশলাইয়ের কাঠি। লক্ষ্য: বারুদ মাখানো ছোট্ট মাথাটি। ঐ মাথাটাকেই টিপ করে হিট করতে হবে।

চেষ্টা করলেন অনেকেই।

কিন্তু ব্যর্থ হল ওদের নিশানা।

এবার অরবিন্দের পালা।

আসুন মিঃ ঘোষ এবার আপনার পালা।

হেসে উঠলেন ঘোষ সাহেব।

বলেন কি? জীবনে আমি কোন দিন রাইফেল ছুঁইনি। আমাকে আর রাইফেল ছুঁড়তে বললেন না।

কিন্তু না বললে শুনছেই বা কে?

বন্দুক ধরেন নি তাতে কি হয়েছে? এতো একটা আমোদ বই অন্য কিছু নয়।

অরবিন্দ পারলেন না ওদের সকলের আনন্দ লাভের সদিচ্ছা-টুকুকে নস্যাৎ করে দিতে।

রাইফেল হাতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন অরবিন্দ। বুঝে নিলেন নিশানা করার কায়দা-কানুন।

আর তারপর?

অবাক কাণ্ড!

লক্ষ্য বিঁধলেন তিনি।

একবার, দু'বার, তিনবার।

সকলে তারিফ করলেন অরবিন্দকে।

ধন্যবাদ মিঃ ঘোষ। সাবাস!

বল, ব্রিটিশ সরকার তুমি ভারত ভাগ্য বিধাতা সাজতে চেয়েছো বলে তুমি যা বলবে তাকেই আমাদের বেদ বলে মেনে নিতে হবে?

নিজের উপর যে অরবিন্দের এত আস্থা তিনি ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেন নি, এ কথা বিশ্বাস করতে বল?

কিন্তু বিশ্বাস কর ব্রিটিশ শাসক; আজ তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমরা যে আমাদের কী মহৎ উপকার করলে সে কথা তোমাদের বোঝাব কি করে? তোমাদের অভিসম্পাতই তো শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদ্ হয়ে দাঁড়ালো আমাদের কাছে।

তাই আই. সি. এস. অরবিন্দকে আমরা না পেলেও বিপ্লবী অরবিন্দকে আমরা পেলাম, পেলাম ঋষি অরবিন্দকে।

এ তো বিধি নির্দিষ্ট হয়েই ছিল!

তা না হলে যে অববিন্দ পুরো চৌদ্দ বছর বিলেতে কাটালেন, কাটালেন বিলেতী আদব-কায়দা, আবহাওয়া-পরিবেশের মধ্যে, যেখানে পদে পদে লোভ আর আকর্ষণ, বিলাসিতা আর ভোগ সেই অরবিন্দ এত লোভের হাতছানিকে জয় করলেন কি করে? পাণ্ডিত্যের কমতি ছিল না অরবিন্দের বিন্দুমাত্র অথচ তিনি ভাবছেন, জ্ঞান সাগরের তীর ভূমিতে তিনি শুধু নুড়িই কুড়িয়েছেন এত কাল, পরশ পাথরের সন্ধান পান নি তিনি।

তা ছাড়া কি?

ভারতীয় শিক্ষা, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সাধনা ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তিনি তো পরিচয়ের কোন সুযোগ পেলেন না।

একী হল তার? মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক স্থাপনের কোন সুযোগই হল না তার জীবনে।

ছিঃ ছিঃ এ তিনি কি করেছেন?

থাক বিলিতি ডিগ্রী শিকেয় তোলা, থাক বিদেশী সভ্যতার মোহ নাগালের বাইরেই।

দেশেই ফিরবেন তিনি।

জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।

দেশে ফিরে এলেন একে একে তিন ভাই।

প্রথমেই ফিরলেন অরবিন্দ—তারপর বিনয় ভূষণ—তারও পরে মনোমোহন।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করছিলেন ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ পুত্র অরবিন্দের প্রত্যাবর্তনের জন্য।

কিন্তু ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

ইহজন্মে পিতাপুত্রে মিলন আর সম্ভব হল না।

পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ স্বপ্ন দেখতেন: পুত্র অরবিন্দ আই. সি এস. পাশ করে ঘরে ফিরবেন। একজন জাঁদরেল অফিসার হবেন অরবিন্দ। ভারতবাসীর সব চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত চাকুরী যদি তার ছেলে পান তাহলে পুত্র গর্বে পিতার বুক বড় হয়ে উঠবে বৈ কি।

কিন্তু ভাগ্য বিধাতা বিরূপ।

আই. সি. এস. ডিগ্রী পাওয়া অরবিন্দের পক্ষে সম্ভব পর হল না।

কৃষ্ণধন ভেঙে পড়লেন। তবু ছেলের উপর রাগ নেই, নেই পুত্রের প্রতি পিতার বিন্দুমাত্র অভিমানও।

অরবিন্দ যে তার সাত রাজার ধন এক মানিক। বড় আদরের।

সেই অরবিন্দ দেশে ফিরে আসছেন। যখন এ সংবাদ পিতার কাছে এসে পৌঁছাল তখন ডাঃ ঘোষ আনন্দে উদ্বেল।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পুত্রের প্রত্যাবর্তনের। খবর নিচ্ছেন নিয়মিত বিলিতি জাহাজের।

কিন্তু হঠাৎ!

হঠাৎ একেবারে বিনা নোটিশে ডাঃ কৃষ্ণধনের পায়ের তলার মাটি সরে গেল।

এ কোন্ দুঃসংবাদ তিনি পেলেন?

অরবিন্দ যে জাহাজে করে রওনা দিয়েছেন জেনেছেন সেই জাহাজটাই লিসবন বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছেই সাগরের জলে ডুবে গেছে। প্রাণ হারিয়েছে যাত্রীরা।

তাহলে অরবিন্দ?

অরবিন্দ আর নেই। একথা ভাবতেও পিতার বুকে যেন শেল বিদ্ধ হতে লাগল। এ কী শুনছেন তিনি।

আর ভাবতেও পারেন না ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ।

আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

আর সেই যে তিনি মূর্চ্ছা গেলেন—সে মূর্চ্ছা আর ভাঙল না।

অথচ এ সংবাদ তো ভুল।

যে জাহাজ ডুবির ঘটনা কৃষ্ণধন জানলেন সে জাহাজে অরবিন্দ আসলে রওনা হতেই পারেন নি। তিনি অন্য জাহাজে রওনা দিয়েছিলেন।

কিন্তু হায় পিতা!

তোমার স্নেহ আর কোনদিন অরবিন্দকে ঘিরে বিবর্তিত হবে না। তুমি যে তোমার প্রিয় পুত্রকে একা ফেলে রেখে অমরালোকের পথে অমৃতের যাত্রী হলে সেখান থেকেই তুমি তোমার পুত্রকে আশীর্বাদ করে যাও। একবার অন্ততঃ চোখ মেলে দেখো সারা ভারত জুড়ে তোমার ছেলের আত্মীয়। আজ যেন ভেঙচি কাটছে কোন্নগরের সেই সমাজ পতিদের যারা অযথা তোমায় একঘরে করে রেখেছিল।

অরবিন্দ দেশের মাটিতে পা দিলেন সুস্থ শরীরে।

কিন্তু শুনতে পেলেন পিতার মৃত্যু সংবাদ, জানতে পারলেন পিতার মৃত্যুর কারণও।

হু হু করে কেঁদে উঠলেন অরবিন্দ।

এ দুঃখের যে আর শেষ নেই।

তিনিই তো পিতার মৃত্যুর জন্য দায়ী!

কিন্তু নিয়তি।

আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে গেছে বলেই হয়তো মারা গেলেন কৃষ্ণধন ঘোষ।

কিন্তু কে এই সান্ত্বনার বাণী আজ শোনাবে অরবিন্দকে। পিতার ইচ্ছাটুকুও যে তিনি আজ সফল করে ফিরতে পারেন নি।

ভয় কি অরবিন্দ, আমি তো আছি।

খুশীতে উচ্ছল মাতামহ রাজনারায়ণ বসু।

বুঝেছিলেন তিনিই, অরবিন্দ আই. সি. এস. না হওয়ায় কোন ক্ষতি হয় নি। অরবিন্দ যে সৌম্য পাণ্ডিত্যের প্রতিমূর্তি। এ পাণ্ডিত্যের মূল্যই বা কম কিসে? অরবিন্দ যে মূর্তিমান প্রতিভা —এ কথা স্বীকার না করলে যে সত্যের অপলাপ হয়।

শুরু হল তিন ভাইয়ের চাকুরী জীবন।

বিনয় ভূষণ কাজ নিয়ে চলে এলেন কোচবিহার।

কিছু দিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ পেলেন মনোমোহন।

কিন্তু অরবিন্দ?

সুদূর বরোদা রাজ্য হল অরবিন্দের কর্মক্ষেত্র।

তখন অরবিন্দ বিলেতে। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির অধ্যায়। আর এ অধ্যায়েই অরবিন্দের পরিচয় হল বরোদার গায়কোয়াড় সয়াজি রাও-এর সঙ্গে। তিনিও তখন লণ্ডনে।

মাত্র এইটুকু পরিচয় সম্বল করে অরবিন্দ হাজির হলেন বরোদায়।

গায়কোয়াড় সয়াজিরাও বুঝেছিলেন, অরবিন্দ ঘোষ অসামান্য প্রতিভার অধিকারী।

সুতরাং অরবিন্দ সম্পর্কে আজ তার মনে বিন্দু মাত্র দ্বিধা নেই, নেই অযথা সঙ্কোচ টেনে এনে তাকে দূরে সরিয়ে রাখার কোন কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা।

চাকুরী পেলেন অরবিন্দ বরোদায়।

সেটেলমেণ্ট বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগে কাজ নিলেন অরবিন্দ।

আর অবসর সময়?

তিনি গাইকোয়াড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবেও করে দিতেন অনেক কাজ।

কিন্তু অরবিন্দের কি তাতে মন ভরে?

আই. সি. এস. এর মোহ যাকে বাঁধতে পারে নি বরোদা রাজ্য তাকে বাঁধবে কি করে?

ইংলণ্ডে এসে তিনি যেমন বিদেশী পরিবেশ আর আকর্ষণ, লোভ আর মোহ, সব কিছুকে হেলায় তুচ্ছ করে শুধু মাত্র শিক্ষা আহরণেই ব্রতী হয়েছিলেন, শুধু শিক্ষা অর্জনই ছিল জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তেমনি বরোদায় যে কাজ তিনি পেলেন তাতে শান্তি পেলেন না। মানসিক শান্তিই যেখানে বড় কথা সেখানে প্রাণের যোগাযোগ আশা করা যায় কি করে?

ফলে ভাল লাগল না তার রাজস্ব বিভাগের চাকুরী, ভাল লাগল না সেটেলমেণ্ট বিভাগও।

পরিবর্তন করতে হল চাকুরীর পদটিকে!

তিনি যোগ দিলেন শিক্ষা বিভাগে।

আজন্ম শিক্ষাব্রতী অরবিন্দ হয়তো বা মানসিক তৃপ্তি পাবেন এ দপ্তরে।

অরবিন্দ তখন একুশ-বাইশ বছরের যুবক।

তাতে কি হয়?

আত্মসুখের চিন্তা নেই, চঞ্চলতা নেই, আছে শুধু জ্ঞান সাধনা। সঙ্গী হল শুধু বই আর বই।

বরোদা কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক অরবিন্দ।

অমিত প্রতিভাধর অরবিন্দ খুব সহজেই সফলতা অর্জন করলেন অধ্যাপনা জীবনে। হয়তো প্রথম প্রথম বিদেশী পরিবেশে

এত কাল শিক্ষা গ্রহণের জন্য সেদেশী শিক্ষা পদ্ধতি এদেশের ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাও খুব বেশী দিনের নয়।

অসুবিধা কাটিয়ে উঠলেন অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই। আর ছাত্ররা? তারা পেল তাদের প্রিয় অধ্যাপক অরবিন্দকে।

এবার অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে পেলেন ভারতীয় কাব্য, সাহিত্য দর্শন পাঠের অখণ্ড অবসর।

শুরু হল নতুন করে মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচয়।

বাংলা ভাষা শিখতে হবে—শিখতে হবে সংস্কৃত ভাষাও।

আঠার শ' আটান্নববই সালের কথা।

দীনেন্দ্র কুমার রায় এলেন বরোদায়।

উদ্দেশ্য অরবিন্দকে বাংলা শেখাবেন।

অরবিন্দের মামা যোগীন্দ্রনাথ বসুই অরবিন্দের জন্য এই শিক্ষক নিয়োগ করলেন।

দীনেন্দ্র কুমার রায় এলেন বরোদায়।

কিন্তু হতাশ হলেন তিনি।

কেন?

দীনেন্দ্র কুমার রায় হয়তো ভেবেছিলেন বিলেত-ফেরৎ একজন সাহেবকে তিনি বাংলা শেখাবেন। বিশেষতঃ অরবিন্দ যখন চৌদ্দ বছর বিলেতে কাটিয়ে এসেছেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, তার কল্পনা আর বাস্তব—এ দু'য়ের মধ্যে আকাশ-জমিনের ব্যবধান, তখনই এই হতাশা।

কিন্তু এ হতাশা দীর্ঘকালের নয়। অরবিন্দের জ্ঞানার্জনের স্পৃহাটুকু লক্ষ্য করে, লক্ষ্য করে তাঁর পাণ্ডিত্য, লক্ষ্য করে ফরাসী

ইংরাজী, ল্যাটিন, গ্রীক এগুলোর উপর তার দখল—এ হতাশাভাব কেটে গেল দীনেন্দ্রকুমারের।

অরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় হল দীনেন্দ্রকুমারের।

অরবিন্দের হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তিনি তৃপ্ত। হীনমন্যতা নেই কোথাও, নেই সংসারের কুটিল চক্রের অসূয়া স্পর্শ। এ যে শিশুর সারল্যে বড় উজ্জ্বল। বড় প্রাণবন্ত। কোথায় স্বার্থপরতা? শুধু আছে স্বার্থত্যাগের একটা মহিমা।

পৃথিবীর মানুষে কি এও সম্ভব?

অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন দীনেন্দ্রকুমার।

আর কি তার পাঠানুরাগ?

তারিফ না করে সেদিন উপায় ছিল না দীনেন্দ্রকুমারের।

তারিফ করতে হয়েছিল তার উদার হৃদয়েরও।

বরোদায় চাকরী নিয়েছিলেন। মাসমাহিনাও তার কম ছিল না। প্রায় হাজার টাকা। অথচ হলে কি হয়? মাসের শেষে তবু টানাটানি। হাতে একটি পয়সাও নেই।

মাকে বা বোনকে টাকা পাঠাতেন। বই কিনতেন। যারা প্রার্থী হয়ে তার দুয়ারে এসে দাঁড়াত তাদের কোনদিন বিমুখ করতেন না তিনি। তাই নিজের বেলায় ঐ বিরাট মাস-মাহিনার একটা সামান্য অংশই পড়ে রইত। এতে হয়তো কৃচ্ছ সাধন করা যায় কিন্তু অভাব মেটে না। মেটে না প্রয়োজনের বিরাট গহ্বর।

তবু দুঃখ নেই অরবিন্দের। ভাবনা তো নেই-ই।

ব্রহ্মচর্য নিরত অরবিন্দ, পরদুঃখকাতর অরবিন্দ, আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী অরবিন্দ কোনদিন টাকা-আনা-পাই-এর হিসেব মেলাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন নি।

তাই মিতাচারী জীবনে তিনি ছিলেন সুখী। সুস্বাস্থ্যের অধিকারীও।

সেদিন অরবিন্দ একটা মানিঅর্ডার ফরম পূরণ করতে ব্যস্ত।

এলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়।

অরবিন্দ অবাক! এসময় তো দীনেন্দ্রবাবুর আসবার কথা নয়। হাতের কলমটা নামিয়ে রাখলেন বাধ্য হয়েই।

জিজ্ঞেস করলেন।

কি ব্যাপার দীনেন্দ্র বাবু। হঠাৎ অসময়ে? কিছু বলবেন?

না, এমনিই এসেছি তেমন কিছু বলবার নেই।

কিন্তু অরবিন্দের যেন মনে হল কিছু বলতেই উনি এসেছেন।

বলুন না কি বলবেন?

তবু সঙ্কোচ যায় না দীনেন্দ্র কুমারের।

ভাবছেন দীনেন্দ্র কুমার, কি করে বলবেন? সব সময় সব কথা বলা যায়ও না। খানিকটা লজ্জা সঙ্কোচ এসে কণ্ঠরোধ করেই ফেলে।

তাগিদ দিলেন অরবিন্দ, বলুন না কি বলবেন? আমি কিন্তু বুঝতে পারছি কিছু বলতেই আপনি এসেছেন।

আর এড়িয়ে যাওয়া যুক্তিহীন।

অতএব এবারে আসল কথা বলতেই হল দীনেন্দ্রকুমারকে।

কিছু টাকার বড় প্রয়োজন। বাড়ীতে টাকা পাঠানো উচিত ছিল অনেক আগেই অথচ পাঠাতে পারছি না।

সে কথা আমাকে বলেন নি কেন?

বলি নি, ভাবছিলাম বলব সময় মতো, কারণ আপনার হাতে যদি টাকা পয়সা না থাকে। তাই বিব্রত করতে চাইনি আপনাকে।

ছিঃ ছিঃ, দেখুন তো। কী অন্যায়! কী অন্যায়! বাড়ীতে টাকা পাঠানো দরকার সেকথা আগে বলবেন তো।

আর কোন কথা অরবিন্দ বললেন না।

বাক্স খুলে বের করলেন হাতব্যাগ। তারপর ব্যাগে যা ছিল সব তিনি তুলে দিলেন দীনেন্দ্রকুমারের হাতে।

বললেন, এখন আর এর বেশী টাকা সঙ্গে নেই।

আপনি বরং এটাকাটাই পাঠিয়ে দিন আপাততঃ।

দীনেন্দ্র কুমারের বিস্ময়ের তখন অন্ত নেই।

না, না এ টাকা আমি নিতে পারব না। এ টাকাতো আপনিই কাউকে পাঠাবেন বলে মনিঅর্ডার ফরম লিখতে বসেছেন।

সে তো বাড়ীতে পাঠাব বলে। আপনার প্রয়োজন তাদের চেয়ে অনেক বেশী। আমি না হয় পরেই পাঠাব। আপাততঃ আপনিই পাঠিয়ে দিন।

আর কোন কিছু বলবার সুযোগ অরবিন্দ দিতে চান না দীনেন্দ্র কুমারকে।

লেখা বন্ধ রেখে আপাততঃ মনিঅর্ডার ফরম যথা স্থানে রেখে দিলেন।

অরবিন্দ তখন বরোদায়।

মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্ত আঠার শ' নিরানব্বই সালের শেষের দিকে বরোদায় এলেন। বরোদার মহারাজার নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন রমেশ চন্দ্র।

তিনি তখন উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার।

ইংরাজী সাহিত্যের প্রোথিত-যশা লেখক, কবি-প্রতিভার ধারক রমেশচন্দ্র বরোদায় পৌঁছে জানতে পারলেন, অরবিন্দ এখানেই আছেন।

বরোদায় আসার পর হতেই অবসর মুহূর্তগুলো অরবিন্দ কবিতা রচনার প্রচেষ্টায় ভরিয়ে রাখতেন। কাব্য-পাঠ যেমন চলত তেমনি

সমান তালে চলত কাব্য-চর্চাও। এখবর অনেকেই জানেন, অনেকে জানতেও পেতেন লোক পরম্পরায়।

অরবিন্দের কাব্যচর্চা অবশ্য আজ নতুন নয়।

তিনি যে জন্ম কবি।

চোদ্দ বছর বয়সেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। অবশ্য ইংরাজী কবিতা। আর তা প্রকাশিতও হয়েছিল পত্রিকায়।

ধুম্ পড়ে গিয়েছিল সেদিন সমালোচক মহলে বিস্ময়ের। বিস্ময় বৈকি! একজন চোদ্দ বছরের বালকের—সেও বাঙালী বালকের হাত দিয়ে এমন কবিতা! বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সন্দেহ দোলায় দ্বিধান্বিত হয়ে উঠেছিলেন সেদিন অনেক সমালোচকই।

আজ আবার নতুন পরিবেশে নতুন ভাবে সেই প্রতিভারই অনুশীলনের সুযোগ ও অনুশীলন।

রমেশচন্দ্রও জানতে পেরেছিলেন অরবিন্দের কাব্য-চর্চার কথা।

এক মনীষার আর এক মনীষার সন্ধান।

দেখা করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন রমেশ চন্দ্র অরবিন্দের সঙ্গে।

এলেন অরবিন্দের ঘরে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে।

এক প্রতিভা আর এক প্রতিভার সকাশে আজ আনন্দে উদ্বেল। একটি প্রতিভা আজ দ্বিধাহীন কণ্ঠে প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর অন্য একটি প্রতিভা প্রশংসা শুনে সংকুচিত। বিদ্যা বিনয়ের জন্ম দেয় এ যেন তারই সাক্ষ্য।

তুমি শুনলাম কবিতা লিখছ।

লজ্জায় পড়েন অরবিন্দ।

কোন্‌ক্রমে বলেন, সে সব তেমন কিছু নয়।

তুমি তো শুনেছি রামায়ণ-মহাভারতের অংশবিশেষ ইংরাজীতে অনুবাদও করেছো। দেখি পাণ্ডুলিপি। কেমন হয়েছে দেখি।

অত্যন্ত দরাজ হৃদয়ে রমেশ চন্দ্রের এ আহ্বান। এ চাওয়া।

কিন্তু আপনি যে অনুবাদ করেছেন তার পাশাপাশি রাখার যোগ্যতাও আমার অনুবাদ সাহিত্যের নেই। সেগুলো নিতান্ত ছেলেমানুষি। তুচ্ছ।

বেশ তো তোমার সেই তুচ্ছ লেখাগুলোই দাও। পড়ে তো দেখি, ক্ষতি কি ?

অতএব উপায় নেই অরবিন্দের।

অনুরোধে ঢেঁকি গেলাও যায়। আর এতবড় একজন মনীষী এতবার তাকে বলছেন সে কথাটা তিনি রাখবেন না এড়িয়ে যাবেন সেও বা কেমন ধারা কথা ? অশোভনও বটে।

অরবিন্দ কি কোন অশোভন আচরণ করতে পারেন ?

অতএব অগত্যা তুলে দিতে হল তার হাতে পাণ্ডুলিপি

আর পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়েই রমেশ চন্দ্র ডুব দিলেন অরূপ সাগরে। মুক্তো খোঁজার জহুরী চোখ তার আছে।

তাই এলোমেলো ভাবে শুধু পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো উল্টে-পাল্টেই কোন একটা মন্তব্য জাহির নয়। তিনি আগাগোড়া পড়ে গেলেন পাণ্ডুলিপির সব পাতাগুলোই।

পড়া শেষ হল অবশেষে।

চমৎকার! সুন্দর! দোসরহীন।

তারিফ না করে উপায় নেই রমেশ চন্দ্রের।

অরবিন্দ তাকিয়ে আছেন রমেশ চন্দ্রের মুখের দিকে।

খুশীতে উদ্বেল রমেশ চন্দ্র।

তোমার কবিতা আগে পড়লে আমি কখনই রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ করে সময় নষ্ট করতাম না, অরবিন্দ।

অরবিন্দ অবাক। কী শুনছেন তিনি।

জান অরবিন্দ আমার নিজের কাব্য রচনার প্রয়াসটা ছেলে মানুষই হয়েছে।

এবার অরবিন্দ আরও লজ্জায় অধোবদন।

উত্তর দিলেন, না না কি বলেছেন আপনি? আপনার অনুবাদ সাহিত্যের প্রশংসাও তো খুব হয়েছিল। সেকালীন ইংরাজী পত্রিকা আপনার কবিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সে তো অপাত্রে দান হয়েছে অরবিন্দ। বিশ্বাস কর, তোমার কবিতার সঙ্গে পরিচয় থাকলে আমি কখনই সে লেখা ছাপাতাম না।

চলে গেলেন রমেশচন্দ্র।

কিন্তু অরবিন্দ?

এত প্রশংসা তাকে উদ্বেলিত করতে পারল না, পারল না তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে।

আসলে অরবিন্দ যে এই সব সাধারণ নিন্দা-প্রশংসার উত্তরে। উর্দ্ধে।

ভূপাল চন্দ্র বসুও যথার্থ নির্বাচন করেছিলেন অরবিন্দকে।

বিন্দুমাত্র ভুলচুক্ হয় নি নীলকান্তমণির সন্ধান পেতে।

তাই নিশ্চিন্ত মনে বঙ্গীয় কৃষিবিজ্ঞানের উর্দ্ধতন রাজ কর্মচারী ভূপাল চন্দ্র বসু কন্যা মৃণালিনীদেবীকে সঁপে দিলেন অরবিন্দের হাতে।

বরোদায় থাকতেই অরবিন্দের বিয়ে হয়ে গেল।

ভূপাল বাবু আপন হৃদয়ের উদারতা আর বিজ্ঞানুরাগই করেছিলেন পাত্র নির্বাচনের মাপকাঠি। তাই তার বিচার ভুল হয় নি তার নিজের মনের কাছে। অরবিন্দ যে যথার্থ মানুষ।

কিন্তু আর একজনের মন?

সেখানে ভূপাল বাবুর বিচার ঠিক রায় দেয় নি।

অরবিন্দের পাণ্ডিত্য আর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকে যেমন লক্ষ্য

করেছিলেন ভূপালবাবু অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে, তেমনি তারই অজান্তে কখন যেন এড়িয়ে গেছিল অরবিন্দের সংসার সম্বন্ধে ঔদাসীন্যে ভরা তার সাধনানিরত জীবনটি। আসলে একমুখী ভূপালবাবু অন্যদিক সম্পর্কে হিসেব-নিকেশ করবার অবসর পান নি। আদৌ। হয়তো বা চান নি।

তাই অরবিন্দের প্রতি তার প্রথম রায় যেমন খাঁটি হয়েছিল, অরবিন্দ যেমন বিশ্ববন্দিত হলেন; তেমনি তার সেই এড়িয়ে যাওয়া দিকটিতে তার মেয়ে মৃণালিনী হলেন স্বামী-বিরহিণী। এখানেই ভূপালবাবুর বিচার অসম্পূর্ণ।

অরবিন্দ স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপালন করেছিলেন যথাযথভাবে। সেখানে কোথাও ফাঁকি ছিল না। কিন্তু সব কর্তব্যপালন তিনি করতে পারেন নি, তারই অগোচরে সেখানে রয়ে গেছে অজস্র ফাঁক।

আসলে আগামীকালের বিপ্লবী ও মহাতপস্বীর পক্ষে ফাঁকটা সব সময় বুঝে ওঠা সম্ভবপর হয় নি।

ব্যক্তি জীবন নয় সমষ্টি জীবনই ছিল তার ভাবনা। সংসার নয় সমগ্র দেশই তার ধ্যান ধারণা। দেশ যার কাছে বড়, ক্ষুদ্র সংসার তাকে টেনে রাখবে কি করে?

পারেনি ধরে রাখতে অরবিন্দকে ক্ষুদ্র সংসার।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই।

আহ্বান শুনেছেন তিনি বাংলাদেশের।

তাই আর বরোদা নয়। বাংলার মাটি-মায়ের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি।

হলই বা বরোদা তার কর্মস্থল, না হয় তার জীবন ধারণের সাশ্রয় এখানেই। তাবলে বাংলাদেশের সঙ্গে তার কি তুলনা চলে? না

তুলনা করা যায়? জনমী জন্মভূমি যে তার মনোভূমি। নাড়ীর যোগ যে এখানেই! সেই নাড়ীর যোগ ছিন্ন করা কি সম্ভব? অস্বীকার করা যায় কি সেই মাটি-মায়ের আহ্বান? যায় না। মা ডাকছেন অথচ সন্তান সেই আহ্বানে সমস্ত দেহ মন সঁপে দিতে পারবে না মায়ের চরণ তলে এ ছেলে কেমন ছেলে?

বাংলাদেশ ডাকছে। ডাকছে অরবিন্দকে।

অরবিন্দকে সে ডাকে সাড়া দিতেই হবে।

তোমার কলঙ্ক মুছে দেওয়ার দায়িত্ব তোমার যে সব ছেলেরা নিয়েছে আমিও তাদের পাশেই দাঁড়াব, মা।

কলঙ্ক!

হ্যাঁ, কলঙ্ক ছাড়া আর কি?

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাউজদ্দৌলার পরাজয় হতেই এ কলঙ্কের সূত্রপাত। শেষ স্বাধীন নবাবের পতনে পলাশীর প্রান্তরে শেষ স্বাধীন-রবি গেল অস্তাচলে।

কিন্তু সেদিন ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ জানত এ পরাজয় শুধু সিরাজউদ্দৌলার নয়, এ পরাজয় শুধু বাংলার নয়—এ পরাজয় সারা ভারতের। তাই সেদিন দুর্যোগের মসীলিপ্ত মেঘখানা শুধুমাত্র পলাশীর ভাগ্যাকাশ জুড়েই সীমাবদ্ধ রইল না—দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলার আকাশ—সারা ভারতবর্ষের আকাশ। ভারতবর্ষ হল কলঙ্কিত। পররাজ্যগ্রাসী ব্রিটিশ বেনিয়ার বিরাট গহ্বরে স্থান পেল ক্রমান্বয়ে সারা ভারত। রচিত হল ভারতের কলঙ্কময় অধ্যায়।

কলঙ্ক ছাড়া এর আর ভিন্ন নাম দেওয়া যায় না।

সেদিন আমাদেরই ঘরশত্রু বিভীষণের দল ডেকে এনেছিল

গোবিন্দপুর, সুতানটির লালমুখো বেনিয়াদের। সেনাপতি মীরজাফর, ধন-কুবের জগৎ শেঠ, রাজা রাজবল্লভ, উমিচাঁদ—এরা সবাই সেদিন ঘর শত্রু বিভীষণের ভূমিকা নিল।

ব্রিটিশ বেনিয়া যারা শুধুমাত্র ব্যবসা করতেই আমাদের দেশে এসেছিল তাদের কাছে রাখল ঘৃণ্য প্রস্তাব।

তোমরা সিরাজের বদলে মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানোর ব্যবস্থা করে দাও। বিনিময়ে তোমাদের প্রচুর অর্থ দেব।

সাবাস ঘর শত্রু বিভীষণের দল!

মীরজাফর সেদিন সিংহাসন পেল।

আর ব্রিটিশ বেনিয়ারা পেল প্রচুর উৎকোচ আর উপঢৌকন।

কিন্তু হলে কি হয়? ধোপে তা টিকল না। শুরু হল পালাবদল। মীরজাফরকে বিদায় নিতে হল খুব শীঘ্রই। মীরজাফর গেল, এল মীরকাসেম, আবার মীরজাফর।

বাংলাদেশ তখন নবাবীর ভাঙ্গাগড়ার খেলায় মেতে উঠেছে।

বাংলার গভর্ণর হয়ে এবারে এল ক্লাইভ। দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের কাছ হ'তে ফারমানও পেল ক্লাইভ। সুতরাং বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায় করার অধিকারও তার হস্তগত হল। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে। আর এতে সাহায্য করলেন, দাক্ষিণ্য দেখালেন দ্বিতীয় শাহ আলম নিজেই।

ক্লাইভ প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হল সুচতুর হেস্টিংসের আমলে পৌঁছে। তার সঙ্গে দেশীয় রাজন্যবর্গ পেরে উঠলো না। সে ক্ষমতা তাদের ছিলও না। তাই জাত সাম্রাজ্যবাদ ওয়েলেসলি ছলে বলে কৌশলে গ্রাস করে যেতে লাগল দেশীয় রাজ্যগুলো। কী চমৎকার কৌশল! অধীনতামূলক মিত্রতা! অধীনতা স্বীকার কর, মিত্রতা পাবে। বন্ধুত্বে সূত্রে তোমাকে বেঁধে নেব। বাঃ বাঃ বুদ্ধির তারিফ না করে কী আর উপায়

আছে? পৌঁছে দিলে সামরিক সাহায্য। অধীনস্থ হল দেশীয় দুর্বল রাজ্য গুলো। তারপর ওরাই হল শিখণ্ডি। ওদের সম্মুখ ভাগে রেখে ওদেরই প্রতিবেশী শক্তিশালী রাজ্যগুলির উপর কঠিনতম আঘাত হানলে। আর তোমাদের এই প্রচণ্ড আঘাত সেদিন সহ্য কোরবার মত ক্ষমতা ছিলনা হায়দারাবাদ, অযোধ্যা, তাঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাটের। সুতরাং ওরা তো বাধ্য হবেই ইংরাজশক্তির কুক্ষিগত হয়ে পড়তে। পড়েছিলও।

এল ডালহৌসী। লর্ড ডালহৌসী আরও এক ধাপ উপরে। এবারে আর অধীনতা মূলক মিত্রতা নয়, একেবারে স্বত্বলোপ নীতি —একেবারে আড়াল আবডাল সরিয়ে ফেলা আর কি। সাঁতারা, সম্বলপুর, ঝাঁসি, নাগপুর এবার এই নূতন নীতির আওতায় এসে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে ইংরাজদের অধীনে এল।

ভারত আজ ব্রিটিশ-ভারতে হল রূপান্তরিত।

তারপর?

তারপর আর কি? দীর্ঘকাল একটানা সেই কলঙ্কময় অধ্যায়েরই টানা-পোড়েন।

কিন্তু কত দিন আর সহ্য করা যায়?

সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে।

এল আঠারশ' সাতান্ন। সাম্রাজ্যের দেশ বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন কোরবার জন্য আমরা মরিয়া হয়ে উঠলাম।

শুরু হল ইংরাজ অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম গণ-বিপ্লব।

কিন্তু তোমরা—ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা? ক্ষমতায় তখন তোমরা মদমত্ত। ফলে স্বীকৃতি দিলে না একে গণ-বিপ্লব হিসেবে। বললে,

এ সিপাহী বিদ্রোহ। তা বল। তাতে আমাদের কি এসে যায়? আমরা তো জানি কখনই একে সংক্ষিপ্ত বিদ্রোহ আখ্যা দিয়ে অধ্যায়ের ইতি টানা সম্ভব নয়—কারণ পরবর্তী কালে সারা ভারত জুড়ে যে গণ বিপ্লব শুরু হয়েছিল তার মূল প্রেরণা তো এই আঠারশ' সাতান্ন সালের বিপ্লবই। যাকে তোমরা সাময়িক বিদ্রোহরূপে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিলে?

এই সিপাহী বিদ্রোহই কিন্তু আমাদের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।

দেশীয় রাজশক্তির একটা বিরাট অংশ নেতৃত্ব দিলেন এই যুদ্ধে, ইংরাজ সামরিক বাহিনীরই একটা বিরাট অংশ প্রাণপণ যুদ্ধ করলো ইংরাজদের বিরুদ্ধে—এ কথা তো আর অস্বীকার করা যাবে না।

আরও একটু গভীর ভাবে ঘটনাগুলো পরম্পরায় সাজাবার চেষ্টা কর মহানুভব ব্রিটিশ। তাহলেই বুঝতে পারবে এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ।

তোমরা প্রভু সাজলে ভারতীয়দের।

একেবারে রাজ্যের গোড়াপত্তন হ'তে শুরু করেই নানা ফন্দি ফিকিরে সাম্রাজ্যগ্রাসের লালসাটাকে বজায় রাখতে একটার পর একটা দেশীয় রাজ্য গ্রাস করে চললে। যারা রাজ্য হারালেন, হারালেন স্বাধীনতা তারা মুখ বুজে তোমাদের এ অন্যায় আচরণ চিরকাল সহ্য করে যাবেন এ কল্পনায় তোমাদের এল কী করে? সুতরাং দেশীয় রাজন্যবর্গ ইংরাজ বিদ্বেষী হয়ে উঠবেন এ আর বেশী কি! ওরা দীর্ঘকাল ধরে যে প্রবল ঘৃণা তোমাদের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছিল মনে মনে তা-ই প্রকাশ্য বিপ্লবের রূপ নিল আঠার শ' সাতান্ন সালের যুদ্ধে। সেদিন তোমাদের হটিয়ে দেওয়াই ছিল একমাত্র ওদের লক্ষ্য।

উত্তর ভারতের সর্বত্র বিপ্লব। নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপী রাণী লক্ষ্মীবাঈ সবাই নেতৃত্ব দিলেন। সংগ্রাম চলল প্রায় একবছর।

বিপ্লবের এমন একটা পর্য্যায় এল যে জাতীয় বাহিনী সেদিন

দিল্লীর মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করতে দ্বিধান্বিত হয়নি বিন্দু মাত্র।

কিন্তু কপাল আমাদের মন্দ।

তাই নেতৃত্বের বড় অভাব। বড় অভাব সংগঠনের।

সুতরাং নির্মূল হয়ে গেল সিপাহীদের জয়ের আশা।

আর বিপ্লবীরা? ওরা তো তোমাদের চোখে বিদ্রোহী। সুতরাং পেল সুকঠোর শাস্তি।

স্বাধীনতা আমরা পেলাম না। কিন্তু ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের মেয়াদের হল শেষ। ভারতের শানন ভার হল হস্তান্তরিত।

শুধু একটি মাত্র ঘোষণা।

এবারে শাসন ভার গ্রহণ করলেন স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী।

"ভারতবাসীর ধর্ম বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, প্রাচীন আচার-ব্যবহার এ গুলোর উপর আর হস্তক্ষেপ করা হবে না।"

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এ বাণী প্রচারিত হল ব্রিটিশ ভারতে। আর আমরা? ভারতীয়েরা? ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা লাভের যে স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলাম সেই স্বপ্ন টুটে গেল। আশ্চর্য্য! আমরা অনায়াসে আমাদের মূল লক্ষ্য হ'তে সরে এলাম। আসলে সেদিন 'ভারত শাসন আইন' আমাদের কাছে মনে হয়েছিল ঘুমপাড়ানি গান।

কিন্তু এতো মরণ-ঘুম নয়।

তাই কালসমুদ্রে বিশটি বছর বিলীন হয়ে যাওয়ার পরই আমাদের ঘুম ভাঙল, নেশা টুটল, সুপ্তি হ'তে ঘটল জাগরণ। আমরা অত্যন্ত অনায়াসে বুঝতে পারলাম, ভারত শাসন আইন রূপ ছেলের

হাতের মোয়া আমাদের ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যেন আমরা আসল উদ্দেশ্য হ'তে সরে দাঁড়াই। সরে সেদিন দাঁড়িয়েছিলামও।

কিন্তু আর সরে দাঁড়াতে রাজী নই।

তাই যারা প্রগতিপন্থী তারা দাবি তুললেন, শাসনতন্ত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ চাই।

গঠিত হল : ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি, বেঙ্গলব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়া লীগ—আর সকলের লক্ষ্য একই। শাসনতন্ত্রে অংশ চাই।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাই যেদিন ভারতসভা নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন সেদিন ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীরও টনক নড়ল। ওরা বুঝল রাষ্ট্র-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করার জন্য জাতীয় আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে রাষ্ট্র-বিপ্লব।

ভয় পেয়েছিল ইংরাজ।

তাই আন্দোলনের গতিটাকে এক নিয়মতান্ত্রিক ছকে ফেলতে চাইলে ওরা। প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাও চালাল এই ব্যাপারে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ। যে কোন মাশুলের বিনিময়েই হোক্ না কেন, ছলে বলে কৌশলে ভারতের আন্দোলনের গতিকে ভিন্ন মুখী করে তুলতেই হবে।

সেদিন ইংরাজ সরকারের এ চেষ্টায় ঘাটতি রইল না বিন্দুমাত্রও।

ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলো লর্ড ডাফরিন। ধূর্ত ডাফরিন ভারতবাসীকে মফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়াতে চাইলো। তাই ভারতবাসীর মতামত জানাবার জন্য বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবাসীকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপক্ষে সম্মতি দিল।

আঠারশ' পঁচিশ খৃষ্টাব্দে বাঙালী ব্যারিষ্টার উমেশ চন্দ্র বন্দ্যো-

পাধ্যায় সভাপতি নির্বাচিত হলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শুরু হল প্রথম অধিবেশন।

কিন্তু কী বদান্যতা তোমাদের ব্রিটিশ শাসক!

সর্ত চাপিয়ে দিলে এই সভার উপরে।

বছরে একবারের বেশী এ অধিবেশন ডাকা চলবে না।

নাই বা হল।

দেশের নেতৃবর্গ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে দেশের নানা অভাব অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ তো পাবেন. আবেদন তো জানাতে পারবেন। যদি সুরাহা কিছু করার থাকে তাহলে একবারের অধিবেশনই বা কম কিসে?

কিন্তু না কোন সুরাহা হয়নি।

আসলে কাগজে কলমে সম্মতি দান কাগজ কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সীমা হতে বের হয়ে আসা আর সম্ভব পর হয় নি।

তোমরা তো চাওনি আদৌ যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে কোন প্রকার জনমত গঠিত হোক।

তাই জনমত গঠন রোধ করাই ছিল সেদিন তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

সুতরাং আরোপ করলে রাজদ্রোহ আইন। চালু করলে সংবাদ পত্র আইন। দেশের জনমত গঠন ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের মত এমন কার্যকরী ভূমিকা আর কে নিতে পারে?

এবারে কিন্তু আমাদের নেতৃবর্গ ভুল বুঝতে পারলেন।

আবেদন-নিবেদনে কোন মহতী উদ্দেশ্য সফল সম্ভব নয়, সম্ভব হতে পারে না। ব্রিটিশ সরকারের বধির কর্ণে আবেদন-নিবেদন পৌঁছায় না। তা অরণ্যে রোদনেরই সামিল।

সুতরাং প্রতিক্রিয়া দেখা দিল নেতৃবর্গের মনে।

চরমপন্থা গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তাদের তাই একমাত্র লক্ষ্য হল : ভারত হ'তে ইংরেজকে হটাতে হবে। ইংরেজ সরকারের কায়েমী শাসন যন্ত্রটাকে বিকল করে তুলতে হবে।

সাড়া দিল দেশের তরুণ সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশী।

ওরা এখন ব্রিটিশ বিদ্বেষী।

স্বাধীনতা অর্জন করতেই হ'বে। আজ ওরা মরিয়া।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে পৌছে তাই শুরু হল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন।

স্থাপিত হল গুপ্ত সমিতি। শুরু হল শক্তির চর্চা। সচেতন হয়ে উঠল অস্ত্র সংগ্রহে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর প্রস্তুতি পর্ব এখন।

বাংলা আর মহারাষ্ট্র এগিয়ে এল সর্বপ্রথম। ঐ দুটি দেশই হল আজ বিপ্লবের কেন্দ্র স্থল!

বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়—এঁদের কেউ চাইলেন না ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আপোষে আসতে। আপোষ কোন মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে পারে না। অতএব ওরা হলেন চরমপন্থী।

আর বাংলা দেশ?

সন্ত্রাসবাদীর পুণ্যভূমি তখন বাংলাদেশ।

লর্ড কার্জন উপলব্ধি করলো অত্যন্ত অনায়াসেই, বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদী দলের প্রধান ঘাঁটি। অতএব এই সন্ত্রাস বাদীদের ঘাঁটিটাকে ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করে দিতে হবে।

কার্জন অজুহাত দেখালেন বঙ্গ ভঙ্গের প্রয়োজনীয়তাকে স্থাপন

করতে গিয়ে। Partition of Bengal is a settled fact. বঙ্গ বিভাগ করবেই এই সেদিন ছিল তোমার ঘোষণা কার্জন।

কার্জনের পরিকল্পনা বাংলাদেশ দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশে ভাগ হয়ে যাবে। পূর্ব বাংলা আর আসাম নিয়ে একটি প্রদেশ ; আর পশ্চিম বাংলা, বিহার আর উড়িষ্যা নিয়ে অন্যটি।

কিন্তু আমরা মেনে নিতে পারলাম না তোমাদের ঔদ্ধত্য।

বিধাতার বিধানকেও বানচাল করবে এত ক্ষমতা তোমাদের এল কী করে ব্রিটিশ ?

প্রতিবাদ জানাল বাঙালী।

নেতৃত্ব দিলেন সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

We must unsettle the settled fact.

আমরা বঙ্গ বিভাগ মানি না। ব্রিটশের পরিকল্পনা আমরা ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলবই।

কারণ—এতো সত্যকথা ব্রিটিশ অপশাসন সম্পর্কে বাংলা দেশ আজ সচেতন। সুতরাং বাংলা দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে। বাংলাদেশকে পঙ্গু করার জন্যই তোমরা, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ, সেদিন তোমাদের কূটনীতি ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল প্রয়োগ করলে।

দেশ ভাগ করে, সম্প্রদায় ভাগ করে, জাতিতে জাতিতে ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চাইলে।

কিন্তু আমরা তা মানব কেন ?

তোমরা বাংলাদেশকে পঙ্গু করবে আর আমরা তাই নিরাপদে বসে বসে বসে দেখব। তা কি হয় ?

সুতরাং শুরু হল জনমত সংগঠন।

কবি-সাহিত্যিক এগিয়ে এলেন দেশের দুর্দিনে। গ্রহণ করলেন নতুন ব্রত। রবীন্দ্রনাথ রাখি বন্ধনের মাধ্যমে বাঁধতে চাইলেন বাঙালীকে একসূত্রে। মন্ত্র হল, ভাই ভাই, এক ঠাঁই।

সেই মন্ত্রই তিনি গানে বেঁধে দিলেন,

বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন পেল সর্বভারতীয় রূপ।

বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, লালা লাজপৎ প্রমূখ নেতারা নেতৃত্ব দিলেন এই সর্বভারতীয় আন্দোলনে। ভারত বাসীর কানে কানে মন্ত্রোচ্চায়িত হল, বন্দেমাতরম্!

সমগ্রদেশ জুড়ে তখন শুরু হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন।

বিলাতি বর্জন কর। বিলাতি কাপড় বয়কট কর। বিলাতিদ্রব্য পরিত্যাগ কর। সেদিন আন্দোলন কারীরা জানতেন ব্রিটিশ-বেনিয়াকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল করা অত্যন্ত সহজ। অন্ততঃ সে কৌশল তাদের জানা আছে।

সুতরাং শুরু হল পিকেটিং।

অফিস আদালত, মাদক দ্রব্যের দোকানের সামনে চলতে লাগল পিকেটিং পথের ধারে পুড়তে লাগল বিদেশী কাপড়ের স্তূপ।

কিন্তু তোমরা সেদিন ভয় পেয়েছিলে। প্রমাণ চাও?

পার্লামেন্টের সভ্য মিঃ ম্যাকলিন বললেন,

A resolution to boycott American goods has been passed and acted upon by China. But the Bengal resolution affects a much more extensive trade and is an alarming matter.

আর তোমাদের মর্নিং পোষ্ট পত্রিকার সম্পাদক?

তিনি তো লিখলেন,

The people of Bengal, buffled in all their attempts to make their protests avail by other means have now united to adopt the methed of Boycott, that

particular weapon, and we are not among those who profess to smile at it.

কি বল অহঙ্কারী ব্রিটিশ, এই প্রমানই কি যথেষ্ট নয়?

কিন্তু তোমরা আমাদের উপকারই করেছিলে।

তাই রাখিবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে গিয়ে ব্যাঙ্গলার আনন্দমোহন বসু অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করলেন:

Lord Curzon has done us indeed a signal service and enabled us to lay the priceless foundation of new national life. Our present troubles herald a new birth ; we are going to see the birth of a new nation.

জন্ম নিল নতুন জাতি।

দুঃখের মাঝে হার মানব না—এই শপথে উদ্বেল এ জাতি।

বিদেশী শাসন বর্জন কোরব—বর্জন কোরব বিদেশী দ্রব্য, বিদেশী শিক্ষা।

এ শপথ গ্রহণ করল সেদিন বাঙালী।

উন্মাদনা সেদিন সর্বত্র।

উন্মাদনা বরোদা নিবাসী অরবিন্দের মনেও।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন প্রবর্ত্তক কি ভাবে তিনি কববেন এমন একটা ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছিল। প্রতিনিয়ত তার এক ভাবনা ভারতবর্ষ পরাধীন। এ পরাধীনতার হাত হতে মুক্তি চাই। কিন্তু কোন পথে? কি ভাবে তিনি ব্রতী হবেন এ দুঃসাধ্য ব্রত উদ্‌যাপনে—এই ছিল তার একমাত্র ভাবনা।

এল উনিশ শ' পাঁচ।

লর্ড কার্জন বাংলাকে ভেঙে দু'টুকরো করে দিতে চাইল।

কিন্তু বাঙালী কখনই তার এ চাওয়াটাকে অনুমোদন করতে পারে না।

অনুমোদন করতে পারেওনি।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন অরবিন্দ।

রাজ সম্মান, মোটা টাকার মাস-মাহিনা আর খ্যাতির মোহ তাকে ধরে রাখবে সে ক্ষমতা নেই। দুঃখিনী জননীর ক্রন্দন তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না।

দেশ তাকে ডাকছে আর তিনি তা উপেক্ষা করে যাবেন এও কি সম্ভব?

পরাধীন জন্মভূমি—আর তিনি একা বসে রাজসুখ উপভোগ করবেন এ কখনও কি হয়, না হতে পারে?

বরোদায় থাকাকালীন অরবিন্দ রচিত সাহিত্যই তার চিন্তাধারার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। স্বাক্ষর বহন করে স্বদেশ আর স্বদেশ প্রেমিকদের প্রতি তার ঐকান্তিক সহানুভূতি ও সমত্ববোধের কথা।

তাঁর Perseus the Deliverer কবিতায় দৈবশক্তি আর দানব শক্তির সে সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে তা তো শাসক জাতির উৎপীড়নে পীড়িত, নির্যাতিত শাসিত শ্রেণীর মর্মদাহ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

না, শুধু রূপক রচনা নয়, রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনাও তিনি শুরু করলেন বরোদাতে থাকতেই।

আর এই রাজনীতি মূলক প্রবন্ধ লিখতে অরবিন্দকে প্রেরণা দিলেন বোম্বাই হ'তে প্রকাশিত পত্রিকা 'ইন্দুপ্রকাশ'-এর সম্পাদক মণ্ডলীর একজন—কে. জি. দেশ পাণ্ডে।

অরবিন্দের কাছে অভিন্নহৃদয় বন্ধু দেশপাণ্ডের আবেদন।

তুমি আমাদের কাগজে লেখো অরবিন্দ।

আমি লিখব কি?

হ্যাঁ, তুমিই লিখবে। এ আমার একান্ত অনুরোধ।

এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন এমন সাধ্য অরবিন্দের নেই।

অতএব সর্ত আরোপ করে ব্যাপারটার নিষ্পত্তিতে আসতে চাইলেন তিনি।

বেশ, লিখব। কিন্তু সর্ত, ছদ্মনামে লিখব।

দেশপাণ্ডে রাজী।

প্রকাশিত হল অরবিন্দের প্রবন্ধ।

New lamps for old—শিরোনামায় লিখে চলেছেন অরবিন্দ ক্রমাগত।

আর ইন্দুপ্রকাশ-এর পাঠকবর্গ?

ওরা ব্যগ্র হয়ে উঠল এমন রচনাবলীর লেখকের পরিচয় জানতে।

কিন্তু অরবিন্দ রাজী নন।

তিনি শুধু লিখে চললেন চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী প্রবন্ধ নিচয়।

ছুটে এলেন গোবিন্দ রাণাডে পত্রিকা অফিসে।

দেখা করলেন স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে।

বন্ধ করুন এমন অগ্নিময়ী রচনা। শেষ পর্যন্ত আপনাদের রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হতে হবে।

রাণাডের কথায় এখন পত্রিকা-স্বত্বাধিকারী সতর্ক।

এবার অনুরোধ অরবিন্দকে।

ভাষাটা একটু নরম করুন। অন্ততঃ খাদে নামান খানিকটা তা না হলে হয়তো বিপদ আসবে।

কিন্তু কার বিপদ? অরবিন্দের প্রশ্ন। পত্রিকা স্বত্বাধিকারী সম্পাদক মণ্ডলীর বিপদ না তার নিজের বিপদ?

নিজের জন্য ভাবনা নেই অরবিন্দের।

কিন্তু পত্রিকার সম্পাদক গোষ্ঠীর জন্য? তাদের জন্য তো ভাবতেই হ'বে।

অতএব শেষ সিদ্ধান্ত নিলেন অরবিন্দ।

তিনি আর লিখবেন না।

আবার ছুটে এলেন দেশপাণ্ডে।

সে কি! তুমি না লিখলে কাগজের প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু কি লিখব? প্রাণহীন কতকগুলি শব্দ সমষ্টি সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করে লাভ?

লাভ তোমার না হোক। পত্রিকাটা তো বাঁচুক।

বাঁচুক।

রাজী হলেন অরবিন্দ।

কিন্তু প্রাণের সাড়া নেই লেখায়। অতএব কতদিন আর লিখবেন? লেখা বন্ধ হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত আপনা আপনিই।

কিন্তু প্রাণের আবেগ রোধ করবে কে?

তা কি রোধ করা যায়?

এল উনিশ শ' চার সাল।

অরবিন্দ যোগ দিলেন কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে।

তিনি একটা বিরাট আশা নিয়ে এসেছিলেন অধিবেশনে। সে আশা দানা বাঁধল এ অধিবেশনে যোগ দিয়েই।

কংগ্রেসকর্মী ও নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে যে উৎসাহের জোয়ার তিনি লক্ষ্য করলেন তা দেখে অরবিন্দের বুঝি আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই।

মনের উৎসাহ আজ শতগুণে উৎসারিত।

পরবর্তী কাশীর অধিবেশনে তিনি যোগ দিতে পারলেন না।

কিন্তু রইল তার সদাজাগ্রত দৃষ্টি কংগ্রেসের কার্যসূচীর দিকে।

অরবিন্দ তখনও রাজনীতির ক্ষেত্রে যোগ দান করেন নি অথচ রাজনীতির বাইরে থেকেও আজ তার কাছে একটা বিষয় অত্যন্ত

স্পষ্ট : কংগ্রেস আজ আর তার গতানুগতিক খাতে বইছে না। কংগ্রেস ক্রমান্বয়ে দুইভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একটা বিরাট অংশ সেদিন অত্যন্ত সহজেই যেন অনুভব করছিলেন আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ আর সমস্যা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা কখনই তাদের চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে না। এগুলো নিছক প্রহসন। অতএব চরমপন্থী হ'তে হবে ওদের। স্বাধীনতা কি কখনও ভিক্ষায় মেলে? স্বাধীনতা অর্জন করে নিতে হবে? ভিক্ষালব্ধ সম্পত্তি আর জয়ার্জিত বিত্তের মধ্যে যে অনেক ব্যবধান। অতএব চরমপন্থী হয়ে উঠলেন তারা।

সিদ্ধান্ত নিলেন ওরা : ভারতের বুক হ'তে ইংরাজ জাতকে একেবারে ঝাড়ে বংশে নির্মূল করতে হবে বিশেষতঃ শাসক গোষ্ঠীকে। ওদের উচ্ছেদ সাধন করতে না পারলে স্বাধীনতা অর্জন কখনই সম্ভব নয়।

সমধিক সাড়া দিল সেদিন তরুণ সম্প্রদায়।

ওরা আজ ব্রিটিশ-বিদ্বেষী।

স্বাধীনতা অর্জনই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—তা যে কোন মূল্যের বিনিময়েই হোক্ না কেন। আর সেই আকাঙ্ক্ষারই পরিণতিতে শুরু হল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন।

স্থাপিত হল গুপ্ত সমিতি। শুরু হল শক্তি-চর্চা আর অস্ত্র সংগ্রহ প্রচেষ্টা। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে—এ যেন তারই প্রস্তুতি পর্ব। মহারাষ্ট্র আর বাংলা হয়ে উঠল আন্দোলনের প্রাণ-কেন্দ্র।

বাংলার বিপিন চন্দ্র পাল, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়—তাঁরা সেদিন বুঝেছিলেন ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন আপসে আসা অর্থহীন। আপসে রফা করে আর যাই হোক না কোন স্বাধীনতা কখনই আসবে না। চরম পন্থা অবলম্বন ছাড়া সেদিন আর অন্যকোন পন্থা ছিল না ওদের সামনে।

তোমরা অবশ্য এদের প্রতি তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টি নিয়ে তোমাদের অহঙ্কার আর অপশাসনের পরিচয় দিয়ে ঘোষণা করলে ব্রিটিশ শাসক, ওরা Terrorit।

কিন্তু লক্ষ্য করতে পারনি জাতীয় ধমনীতে জীবন সঞ্চারণকে।

অথচ একথা সমান সত্য। যেমন সত্য তোমার সন্ত্রাসবাদী দলকে ভয় পাওয়া, আর ভয় পেয়ে অযথা অত্যাচার আর নিপীড়ণের মাধ্যমে তোমাদের শক্তির ও মত্ততার পরিচয় দেওয়া!

অরবিন্দ অনুভব করেছিলেন, কি করে জাতীয় জীবনের ধমনীতে সঞ্চারিত হচ্ছে নতুন প্রাণ।

তীক্ষ্ণধী অরবিন্দের সামনে তখন জাতীয় আন্দোলনের রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট। যা ছিল তার কল্পনায় তা-ই যেন বাস্তবে রূপ পাচ্ছে। একটা মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করলেন তিনি।

বাংলাদেশের আন্দোলনের মধ্যেই যে তিনি দেখতে পেলেন আপন কল্পনার বাস্তব রূপ পরিগ্রহের সম্ভাবনাকে।

অতএব আর দ্বিধা নয়, নয় কোন সংকোচ।

বৃথা নয় কালক্ষেপ বরোদায়। এবার বাংলা।

এই তো যথার্থ মরসুম।

অরবিন্দ মনস্থির করে নিলেন, কলকাতায় সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কলেজে চাকুরী নেবেন। চলে যাবেন বাংলার প্রাণ কেন্দ্র কোলকাতায়।

সুতরাং দ্বিধা নয়, দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাছে।

শিক্ষা পরিষদ অবাক।

অবাক স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

অথচ দেশের এই মনীষীরা চেয়েছিলেন, কেরানী তৈরীর কারখানাকে বাদ দিয়ে মানুষ তৈরীর বিদ্যালর স্থাপন করতে। তারা সেদিন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন বিদেশী শাসকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ গুলো কখনই দেশাত্মবোধে অনুপ্রেরিত হওয়ার শিক্ষা দিতে পারে না, শিক্ষা দিবে না।

সুতরাং দেশের তরুণশক্তিকে নতুনমন্ত্রে দীক্ষা দিতে হ'লে চাই নতুন স্কুল কলেজ, নতুন পরিবেশ। নিজ জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ, জাতির প্রতি শ্রদ্ধা যদি জাগাতে না পারে সে শিক্ষা আদৌ শিক্ষা নয়।

চিন্তিত হলেন নেতৃবর্গ।

কিন্তু সমস্যাও যে অনেক।

সমস্যা অর্থের, সমস্যা শ্রমের।

নেতৃবর্গের প্রথম আবেদন ব্যর্থ হল না।

এগিয়ে এলেন মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য, জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, এগিয়ে এলেন রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিকও। এরা প্রত্যেকেই জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন সুসম্পূর্ণ করতে দান করলেন, একলক্ষ হিসেবে টাকা। অতএব প্রথম সমস্যার সমাধানে আজ নেতৃবর্গ খুশীতে উদ্বেল।

গঠিত হল : জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।

আর এই পরিষদের অধীনে গড়ে উঠল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন জিলায় জিলায় জাতীয় স্কুল।

কোলকাতা ও রংপুরে স্থাপিত হল জাতীয় কলেজ।

আর ঠিক তখনই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সামনে এল নতুন সমস্যা কোলকাতার কলেজের জন্য একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষ চাই। এই পদের দায়িত্ব যে অনেক, উদ্দেশ্য যে মহান।

কোথায় পাবেন এমন যোগ্য শিক্ষা ব্রতী ?

অথচ শিক্ষা পরিষদ জানেন, তারা দেড়শো টাকার বেশী মাস-মাহিনা দিতে পারবেন না।

সুতরাং কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

আর সেই বিজ্ঞাপনের জবাবে দরখাস্ত পেশ করলেন অরবিন্দ।

দরখাস্তের তাড়া নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অবাক জাতীয় পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য বৃন্দ।

একী! বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষের দরখাস্ত। তিনি ভুল করেন নি তো? এক হাজার টাকার মাসমাহিনা ছেড়ে দেড়শো টাকা মাস মাহিনায় তিনি কোলকাতায় আসতে চান। এ কী করে সম্ভব?

অনেক দ্বিধা আর অনেক অবিশ্বাস নিয়েই নির্বাহক সামতি অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন।

অবাক ওরা সকলেই।

দেশের স্বার্থের জন্য অরবিন্দ বিসর্জন দিচ্ছেন আপন স্বার্থ।

কী বিপুল এ ত্যাগ!

কোথায় অপরিমেয় সুখ—কার্পেট বিছানো বরোদার জীবন আর কোথায় দৈন্যদশার ছেঁড়া মাদুর ছড়ানো বাংলার জীবন।

কিন্তু কেন?

আসলে অরবিন্দ তখন চেয়েছেন ধ্যানমগ্ন জীবনকে কর্মক্ষেত্রে প্রসারিত করে দিতে।

একটা উপযুক্ত কালের অপেক্ষায় শুধু এতদিন তিনি ভারতীয় কাব্যসাহিত্য-দর্শন নিয়ে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা অবলম্বন করে ধ্যানমগ্ন হয়ে ছিলেন।

তাছাড়া আর কি ?

তাই অত্যন্ত অনায়াসে ফিরিয়ে দিলেন বরোদার মহারাজের পত্র বাহককে।

অথচ এই পত্র বাহক তো অরবিন্দের সামনে নিয়ে এসেছিল নতুন পদমর্যাদার নিয়োগ পত্র—বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ হ'তে অধ্যক্ষ। নিয়ে এনেছিল আরও ঢালাও সুখের প্রতিশ্রুতি এক হাজারেব বদলে দেড় হাজার টাকা মাস মাহিনা।

মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হয় অরবিন্দ থমকে দাঁড়ান।

এ কী কঠিন পরীক্ষা।

পদে পদে লোভ। পদে পদে এমন হাত ছানি। কর্মক্ষেত্র হ'তে সরে দাঁড়ানোর জন্য এত আকুলতা।

কিন্তু অরবিন্দ হার মানবেন না।

প্রলোভন জয় করতে পারবেন না তিনি কি মার তেমন ছেলে ? মাটি-মার আহ্বানে তখন যে তার শিরা-উপশিরা সাড়া দেওয়ার জন্য আকুল।

অতএব প্রত্যাখ্যান কর মহারাজের এই অনুরোধ মেশানো আহ্বান। উপেক্ষা কর লোভের উপঢৌকন।

তা-ই হল।

দেড় হাজার টাকা নয় দেড়শো টাকাই এখন অরবিন্দের কাছে অনেক মূল্যবান মনে হল।

তার মায়ের এ সামান্য সামর্থকে উপহাস করবেন তিনি কোন্ মুখে ?

বন্দে মাতরম্।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকা প্রকাশ করলেন বিপিন চন্দ্র পাল।

বাগ্মী বিপিন চন্দ্র পাল, তেজস্বী বিপিন পালকে তখন বাংলা দেশের মানুষ এক ডাকে চেনে। দেশের মানুষ জেগে উঠছে। সাড়া দিচ্ছে বিপিন পালের আহ্বানে।

বন্দেমাতরমের লক্ষ্য হল: দেশের মানুষের মনে নব চেতনার উন্মেষ ঘটানো।

দেশ বাসী পেল শক্তি, পেল পথের সন্ধান এ পত্রিকা হ'তে। কিন্তু আরও যেন কিছু চাওয়ার আছে দেশবাসীর।

বিপিন চন্দ্র সিদ্ধান্ত নিলেন: অরবিন্দকে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় নিয়ে আসতে হবে।

আপনি আমাদের বন্দেমাতরম্‌কে সাহায্য করুন, অরবিন্দ বাবু।

অরবিন্দ রাজী হলেন।

এ আহ্বানকে উপেক্ষা তিনি করতে পারেন না কোনো কারণেই। এ আহ্বানে যদি সাড়াই দিতে না পারেন তাহলে বরোদা ছেড়ে বাংলায় এলেনই বা কেন?

থাক না কেন কলেজের অধ্যক্ষের গুরু-দায়িত্ব তবু অবসরও তো আছে। সেই অবসর মুহূর্ত গুলোই তিনি ভরিয়ে তুলবেন বন্দেমাতরম্-এর কাজে। যোগা যোগ রাখবেন, লিখবেন তিনি।

অরবিন্দ ভাবেন, শিক্ষাদানের ব্রত উদযাপন ছাড়াও আর একটি দায়িত্বও তিনি পালন করবেন। এ দায়িত্ব জাতীয় আন্দোলনের।

কিন্তু মানুষের ভাবনার সঙ্গে কার্য সম্পর্কিত হয়ে থাকবে সব সময়—এমন অভিপ্রেত বুঝি ভগবানের নয়।

তা না হলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এমন মতান্তর—আর মতান্তর থেকে অরবিন্দের মনান্তর হবেই বা কেন?

অথচ কত সামান্য কারণ।

ব্রিটিশ পরিচালিত স্কুল হ'তে বিতাড়িত ছাত্রদের তিনি ভর্তি করতে চাইলেন। এই ছাত্রদের অপরাধ? কেনই বা ব্রিটিশ-স্কুল ওদের বিতাড়িত করল? ওদের চোখে অবশ্য ওদের মস্ত

অপরাধ। ওরা স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ওরা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট! কেউবা সরাসরি অংশ নিয়েছে, কেউবা সমর্থন জানিয়েছে। তাই ওরা অপরাধী। অরবিন্দ স্বীকার করেন না ওদের অপরাধ।

অরবিন্দ মনে করলেন এই ছাত্রদের জন্য তার কলেজের দরজা খুলে দেওয়া দরকার।

কিন্তু টনক নড়ল কর্তৃপক্ষের।

কেনই বা নড়বে না।

জাতীয় কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা তো ছিল বিদেশী ধাঁচেই। অরবিন্দের এ শিক্ষায় আস্থা নেই। যেখানে শিক্ষা ধর্মকে সযত্নে এড়িয়ে চলে সেই শিক্ষা শিক্ষা-পদবাচ্য হ'তে পারেনা। ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যই ধর্ম রক্ষার্থে, মানব জাতির কল্যাণার্থে। দেশের জন্য, পরের মঙ্গলের জন্য, নিজের জন্যও যখন বাঁচতে শেখার শিক্ষা দেয় শিক্ষা তখনইতো সার্থক-নামা।

অতএব শুরু হল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর।

স্বাধীন চেতা অরবিন্দ স্বাধীনতা খুইয়ে চাকুরী করতে রাজী নন। টাকার জন্য তো তিনি জাতীয় কলেজের দেড়শো টাকার অধ্যক্ষ হন নি। সেজন্য তো বরোদার দেড় হাজার টাকার মাইনের অধ্যক্ষ পদ ছিলই।

তার সমস্ত অন্তরাত্মা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল!

ইস্তফা দিলেন তিনি কলেজের অধ্যক্ষের পদ হ'তে।

ছাত্রেরা মর্মাহত। তাদের প্রিয় অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ আর তাদের কলেজে তাদের সামনে এসে দাঁড়াবেন না।

কিন্তু সবই তো ভাগ্যের নির্দেশ।

বিদায় জানাতেই হয় একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

উনিশ শ' সাত সালের বাইশে আগস্ট কলেজের ছাত্রেরা অরবিন্দকে জানাল বিদায়-অভিনন্দন।

অরবিন্দ শোনালেন তার প্রিয় ছাত্রদের নতুন কথা, শোনালেন তার মনের আকাজ্ক্ষার বাণী।

তোমরা মহান্ হও। কিন্তু তোমাদের মহান্ হওয়া তোমাদের নিজেদের জন্যে নয়, তোমাদের আপন অহঙ্কারের পরিতৃপ্তির জন্য নয়। তোমাদের মহান্ হতে হবে দেশের জন্য, ভারতের জন্যে। দেশের সেবায় তোমরা আত্মনিয়োগ করবে, ভারতকে গৌরবান্বিত করার জন্য শপথ নেবে। মাকে বাঁচাতে হ'বে। মাকে সমৃদ্ধিশালী করতে হ'বে, মাতৃ-সেবায় সমস্ত জ্ঞান-শিক্ষা, বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়োগ করতে হ'বে। এ-ই হ'বে তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আমার প্রতি নয় আমার আদর্শের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধাই আমার কাম্য।

আর কলেজের রুটিন-জীবন নয়।

এখন কলেজের বন্ধন হ'তে মুক্তি।

এ মুক্তিই তো অরবিন্দের প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ এনে দিল।

'বন্দেমাতরম্' এর সঙ্গে সবিশেষ জড়িয়ে পড়লেন তিনি।

যোগদিলেন পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীও।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ঢেলে দিলেন তার উদ্যম ও কর্মদক্ষতা, অরবিন্দ দিলেন প্রতিভা ও সাধনা।

'বন্দেমাতরম্' এখন আর ইংরাজী সাপ্তাহিক নয়, ইংরাজী দৈনিক। অরবিন্দ এই দৈনিকের সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন।

দেশবাসীর সম্মুখে জাতীয় আদর্শ তুলে ধরাই সেদিন ছিল অরবিন্দের আদর্শ।

মধ্য পন্থী দল সৃষ্ট রাজনৈতিক অন্ধকার দূর করে জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করার ব্রত নিল 'বন্দেমাতরম্'।

শিক্ষাবিদ পরিণতি পেলেন রাজনীতিবিদে। অরবিন্দ এখন জাতীয় আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত।

শোনালেন দেশবাসীকে, আবেদন-নিবেদনে স্বরাজ আসতে পারে না। জাতিকে আত্ম-নির্ভর হ'তে হবে।

স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করতে গিয়ে অরবিন্দ অকুণ্ঠিত চিত্ত। তাঁর বিশ্বাস ভারত স্বাধীনতা লাভ করবেই। সুতরাং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা নাম মাত্র রাজনীতিক সুবিধা লাভের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ হ'তে সরে দাঁড়াবেন—অরবিন্দ এমন নীতি আর আদর্শ নিয়ে রাজনীতি শুরু করেন নি।

অরবিন্দ জাতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। হাল ধরলেন কাণ্ডারী হয়ে। তিনি এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন অনায়াসে, জনসাধারণের পাশাপাশি দাঁড়াতে হ'বে। ওদের পাশে দাঁড়িয়ে দিতে হবে কর্মে প্রেরণা।

সুতরাং নির্দেশ দিলেন অরবিন্দ।

আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্ব গ্রহণের এ নির্দেশ। বাংলার জাতীয় দল সেদিনই উপলব্ধি করতে শিখল অরবিন্দের এ নির্দেশের তাৎপর্য।

জাতীয় দল ছড়িয়ে পড়ল ভারতের সর্বত্র।

প্রদেশে প্রদেশে গঠিত হ'ল জাতীয় দল। নেতৃত্ব দিলেন তিলক, নেতৃত্ব দিলেন অরবিন্দ।

জাতীয় দলের সংগঠন শক্তি ভাবিয়ে তুলল কংগ্রেস নেতৃবর্গকে।

এ কী! জাতির দুর্দিনে, দেশের এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় শুধুমাত্র নেতৃত্বের লড়াই।

সামান্য নেতৃত্বের লড়াইয়ে সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গেল।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না সুরাট কংগ্রেস জাতির পক্ষে একটি কলঙ্ক।

কলঙ্ক ছাড়া এর আর ভিন্ন নাম দেওয়া যায় না।

শুধুমাত্র নেতৃত্ব নিয়ে যে মতান্তর আর মনান্তর শুরু হল তা সামলাতে শেষ পর্য্যন্ত পুলিসকে হস্তক্ষেপ করতে হল। এতো কলঙ্কই।

কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ স্থরাট অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে স্যার রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করলেন। রাখতে চাইলেন তার নিজস্ব কয়েকটি বক্তব্য। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

চারদিক হতে উত্তেজিত জনতা ঘিরে ফেলেছে, তার কোন কথা আর শুনতে রাজী নয়। জুতো, চেয়ার ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছে অধিবেশনে।

সুরেন্দ্রনাথ পালিয়ে গেলেন কয়েকজন বন্ধু ও স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে।

এল পুলিস।

ভেঙে দিল অধিবেশন।

ছত্র ভঙ্গ করে দিল জনতাকে।

অরবিন্দ কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বসেছিলেন মঞ্চের এক পাশে।

সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনের শুরু হ'তে মারমুখী জনতা— পুলিসের হস্তক্ষেপ। কিন্তু অবিচল অরবিন্দ।

তার শুধুমাত্র ভাবনা, সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গেল। ভগবানের এ-ই হয়তো অভিপ্রেত।

কিন্তু কোন কিছুই অমঙ্গলের নয়।

স্থরাট কংগ্রেসের এ খণ্ড যুদ্ধ যেন জাতির জীবনে নিয়ে এল বিরাট পরিবর্তন। জাতি আজ বুঝেছে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা—এ উপলব্ধি একেবারে মনেপ্রাণে।

সুরাট কংগ্রেসে থেকে ফিরে এলেন অরবিন্দ।

শুরু হল পূর্ণ উদ্যমে কর্মযজ্ঞে।

ভারতবাসীর কানে কানে পৌঁছে দিতে হবে দেশ সেবার আদর্শ, স্বাধীনতার বাণী।

অথচ তিনি তো নেতৃত্ব চাননি, চাননি সুনাম, খ্যাতি। শুধু চেয়েছিলেন দেশের মঙ্গল, জাতির কল্যাণ।

বঙ্গ ভঙ্গ বাঙালীর ঘুম ভাঙিয়েছিল। বুয়র যুদ্ধ, রুশ জাপান যুদ্ধ, ইটালি আবিসিনার যুদ্ধ বাঙালী বিপ্লবীদের মনে সঞ্চার করেছিল নতুন প্রেরণা। রাশিয়া দিয়েছিল পথ দির্দেশ।

উনিশ শ' দুই সালেই বাংলাদেশে গুপ্তসমিতি গঠনের সূত্রপাত।

ঋষি অরবিন্দ সেদিন পরামর্শ দিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুদূর বরোদাতেই।

সেনাবাহিনীর কর্মে ইস্তফা দিলেন যতীন্দ্রনাথ। ফিরে এলেন বাংলাদেশে। উদ্দেশ্য গুপ্ত সমিতি গঠন। সমিতির সভ্যদের অস্ত্র পরিচালনায় পারদর্শী করে তুলতে হ'বে।

সেদিন নেতৃবর্গ অত্যন্ত অনায়াসেই বুঝতে পেরেছিলেন ইংরাজকে এদেশ হ'তে অস্ত্র বলে বিতাড়িত করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। অত্যাচারের বদলে অত্যাচার, বেত্রাঘাতের বদলে বুলেট। অথচ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ আমাদের হাত হ'তে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। তুলে দিয়েছে কলম। আজ কলম ছেড়ে হাতিয়াড় ধরার দিন সমাগত। পরাধীন জাতির সুখ স্বপ্ন ভাঙতে হ'বে, জাগাতে হবে তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে, নির্বাসন দিতে হবে ওদের সুখ-বিহ্বল-কল্পনার রাজ্য হতে। ওদের আজ উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হ'বে, নতুন মন্ত্রে দিতে হব নব দীক্ষা, আত্মদান ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। হাসিমুখে জীবনের জয়গান গেয়ে, জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্যরূপে দলিত মথিত করে অস্তমিত স্বাধীনতা সূর্য্যকে উদিত করতে হবে ভারতের উদয়াচলে।

মানিকতলা অঞ্চলে মুরারী পুকুরের এক বাগান বাড়ী বিপ্লবীদের আস্তানা হয়ে উঠল। বিপ্লবীদের হেড কোয়াটার্স। শুরু হল বিপ্লবীদের অনুশীলন।

সুরাট কংগ্রেস থেকে ফিরে এল অরবিন্দ জাতীয় দলের শক্তি বৃদ্ধিতে নিয়োগ করলেন তার সর্বপ্রচেষ্টা।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার জাতীয় দলের এই কার্যকলাপ বরদাস্ত করতে চাইল না। দলটাকে ভাঙতে হবে। অতএব প্রয়োগ করলে তোমাদের দমননীতি।

শুরু হল ধর-পাকর। জাতীয় দলের বহু নেতাই তোমাদের রাজরোষের আওতায় পড়ে তোমাদের কারাগারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন।

এল উনিশ শ' সাত সালেন সাতাশে জুন।

গ্রেপ্তার হলেন অরবিন্দ।

বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ রাজদ্রোহিতার অভিযোগ অভিযুক্ত। অতএব গ্রেপ্তার কর অরবিন্দকে।

যুগান্তর সাপ্তাহিকে প্রকাশিত 'কাবলী দাওয়াই' এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল বন্দেমাতরম্-এ।

কিন্তু তোমরা কি ভাবতে পেরেছিলে সেদিন তোমাদের এত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে?

ভাবনি। ভাবতে পার নি। তাই আদালতে অভিযোগ আনলে অরবিন্দের বিরুদ্ধে। তোমরা অভিযুক্ত করলে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দকে।

কিন্তু আদালতে প্রমাণ করতে পারলে না যে অরবিন্দই বন্দে-মাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক।

চেষ্টা তো কম করনি?

শেষ পর্য্যন্ত বন্দেমাতরম্ কাগজের প্রথম উদ্যোক্তা বিপিন চন্দ্র পালকে পর্য্যন্ত তোমাদের পক্ষ থেকে সাক্ষী মানলে। উদ্দেশ্য:

বিপিন পালের কাছ হ'তে শুধু একবার জেনে নেওয়া অরবিন্দই ঐ কাগজের সম্পাদক। তারপর তোমাদের পায় কে? অরবিন্দের শাস্তি সুনির্দ্ধারিত।

কিন্তু দেখতে পাওনি সেদিন বাঙালীর বুকের উন্মাদনা।

শুনতে পাওনি সেদিন অরবিন্দ প্রশস্তি।

সাবাস অরবিন্দ! বাংলামায়ের সুসন্তান অরবিন্দ তুমি ধন্য।

বাঙালী সেদিন বিপিন পালকে সরকার পক্ষের সাক্ষী মানায় চঞ্চল। কি করেন শ্রদ্ধেয় নেতা বিপিন পাল। কি বলবেন তিনি আদালতে? আদালতে যদি তিনি স্বীকার না করেন অরবিন্দ বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক তাহলে সে শাস্তি তো তার নিজের মাথায় তুলে নিতে হবে। সুতরাং জন-হৃদয়-নেতা বিপিন পাল কি করবেন, কি বলবেন সে দিকেই চেয়ে রইলো সেদিন দেশবাসী।

অবশেষে এল নির্দিষ্ট দিন।

আজ অরবিন্দের বিচার।

আদালত কক্ষ থেকে আদালত প্রাঙ্গণ পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের ঠাঁই নেই কোথাও। কিন্তু চঞ্চলতা নেই, নেই মুখরতা। আছে শুধু দেশের দুই নেতার প্রতি সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। একজন অরবিন্দ—অপরজন বিপিন পাল। একজন কাঠগড়ার আসামী, অন্যজন সাক্ষী।

সরকার পক্ষের সাক্ষী বিপিন পাল উঠে দাঁড়ালেন কাঠ গড়ায়। ভাবলেশ হীন ও মুখ।

রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষমান হাজার হাজার বাঙালী।

কি বলবেন দেশ বরেণ্য নেতা? শুধু শোনার অপেক্ষা।

এগিয়ে এল সরকার পক্ষের কৌঁসুলী।

অরবিন্দ ঘোষকে আপনি চেনেন ?

চিনি। স্পষ্ট উত্তর।

আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার তিনি সম্পাদক।

বিপিন পাল অবিচল।

নির্ভীক কণ্ঠে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন দেশ বরেণ্য নেতা বিপিন চন্দ্র পাল :

I have conscientious Objection to take part or swear in these procecedings.

সাধু! সাধু!

সত্যিই তুমি মহান্। প্রিয় নেতা তুমি, বিপিন পাল।

সরকারের নেকনজর হতে রেহাই পেলে না তুমি। আদালতের আদেশ অমান্য করার অপরাধে তোমাকে অপরাধী হ'তে হল। মাথায় তুলে নিতে হ'ল ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি। কিন্তু তুমি যে আর একবার দেশবাসীর অন্তরে পেলে শ্রদ্ধার অবিচল আসন—তা থেকে তোমাকে কেড়ে নেবে এমন সাধ্য অহঙ্কারী মূঢ় ব্রিটিশের কোথায় ?

অরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

কিন্তু মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ বসুকে রাজরোষের কবল থেকে বাঁচানো গেল না। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম না রইলেও মুদ্রাকরের নাম তো ছাপানো ছিল। সুতরাং অপূর্বকৃষ্ণ বসুকে পেতে হল ব্রিটিশ বিচারকের নির্দেশে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড!

মুক্তি পেলেন অরবিন্দ।

আবার লেখা—আবার বক্তৃতা।

জাতীয়তার আদর্শ, স্বরাজ ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার তাকে করতেই হবে।

অরবিন্দ দেশ বাসীকে দিলেন অগ্নিমন্ত্র।

স্বরাজ চাই। হিংসা পূর্ণ সশস্ত্র বিপ্লব নয়, আগ্নেয়াস্ত্র রক্তপাত নয়, প্রয়োজন শুধু নৈতিক বলবৃদ্ধির। স্বরাজ সত্য ও সংগত দাবি। এ দাবি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব করুণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস আনতে হবে। সুতরাং নৈতিক শক্তি লাভ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কিন্তু অরবিন্দের এ মন্ত্রে জেগে উঠল দেশের দুর্বার তরুণ শক্তি।

ওরা মুক্তি চায়। ওরা চায় এবারে পালাবদল।

নিষ্পেশন আর অত্যাচার অনেক সহ্য করেছে ওরা, আর নয়। এবারে জবাব দিতে হবে। উপযুক্ত জবাব। ব্রিটিশ পুলিশের নির্মম অত্যাচার ওরা আজ আর সহ্য করতে রাজী নয়। মারের জবাব দেবে মার দিয়েই, ব্রেত্রাঘাতের জবাব দেবে বুলেটে।

যৌবন জলতরঙ্গ রোধ করার সাধ্য কার?

অরবিন্দ বুঝলেন, দীর্ঘকাল ইংরাজ অপশাসনের ফলই দেশের তারুণ্য শক্তির জাগরণ। অসন্তোষ বহ্নি অন্তরে ধূমায়িত হচ্ছিল, এখন শুধু মাত্র অনুকূল পরিবেশ পেয়ে লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠতে চায়। এ হুতাশন নির্বাপিত করার সাধ্য কোন শক্তিরই নেই।

বাংলার নানা স্থানে গড়ে উঠল বিপ্লবী দল।

নেতৃত্ব দিলেন অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

বিপ্লবীরা বুঝলেন আজ অ্যাকশন নেওয়ার উপযুক্ত সময় এসেছে।

উল্লাসকর দত্ত গোপনে বোমা প্রস্তুত করছেন আর সেই বোমা পৌঁছে দিচ্ছেন বিপ্লবীদের হাতে।

বিভক্ত বাংলা দেশের দুই গভর্ণর—পূর্ববঙ্গে ব্যামফিল্ড ফুলার আর পশ্চিম বঙ্গে এণ্ড্রু ফ্রেজার—এরা দুজনেই আজ বিপ্লবীদের টার্গেট।

লাটসাহেব ফুলারের গ্রীষ্মাবাস শিলং।

বারীন্দ্র কুমার হাজির হলেন দুটো বোমা ও দুটো রিভলভার সঙ্গে নিয়ে শিলং। মেদিনীপুর গুপ্ত সমিতি হ'তে হেমচন্দ্র দাসও এসেছেন। তিনি সঙ্গে রিভলাভর এনেছেন। একেবারে পাকা বন্দোবস্ত।

কিন্তু ফুলারের ভাগ্য বোধ হয় সুপ্রসন্ন। তাই ফুলার সেদিনই শিলং ছেড়ে গোহাটি চলে এসেছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে।

বুঝতে পারলেন বারীন্দ্র, বুঝতে পারলেন হেমচন্দ্র, শিলং-এ আর অযথা ফুলারের অপেক্ষায় সময় অপচয় করা অযৌক্তিক।

অতএব চল গৌহাটি।

কিন্তু হল না। গোহাটিতে কোন সুবিধাই করে উঠতে পারলেন না বারীন্দ্র বা হেমচন্দ্র দাস। কিন্তু তারা ফুলারের ট্যুর প্রোগ্রাম পেয়েছেন। অতএব শেষ পর্য্যন্ত ফুলার বধ বোধ হয় সম্ভব হবে। তোমার নিস্তার নেই ফুলার।

বিপ্লবীদ্বয় অনুসরণ করলেন ফুলারকে।

পৌঁছালেন বরিশাল। বিধাতার অভিপ্রায় বোধহয় ভিন্ন রকম। তাই বরিশালের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ফুলার বধের বিষয়টাকে ভালচোখে নিতে পারলেন না।

বারীন্দ্রকুমার বিতাড়িত হলেন বরিশাল হ'তে।

কিন্তু বাংলার যুব সম্প্রদায়কে ঠেকিয়ে রাখবে কে ?

হেমচন্দ্র দাস আর প্রফুল্ল চাকী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করলেন ফুলারকে। ফুলার বধে সিদ্ধিলাভ করতেই হবে।

এলেন রংপুরে ওরা দুজনেই।

রংপুরে স্টেশনের এক প্রান্তে বোমা রাখা হল। উদ্দেশ্য, গভর্ণর

ফুলারকে নিয়ে যখন স্পেশ্যাল ট্রেনখানি রেললাইনের উপর দিয়ে যাবে তখন বোমাও বিস্ফোরিত হবে আর—। আর? আর তাদের ফুলার বধের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হ'বে ট্রেনখানি বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু ফুলার ট্রেনে এলেন না।

রংপুর হ'তে স্টীমারে গোয়ালন্দ রওনা হয়ে গেলেন ফুলার। তারপর গোয়ালন্দ হ'তে চলে যাবেন কোলকাতা।

ব্যর্থ হলেন হেমচন্দ্র দাস, ব্যর্থ হলেন প্রফুল্ল চাকী।

কোলকাতা ছাড়া আর ফুলার বধ সম্ভব নয়।

ক্ষুণ্ণ মনে বাধ্য হয়ে রংপুর ছাড়লেন শেষ পর্যন্ত হেমচন্দ্র আর প্রফুল্ল। রওনা দিলেন কোলাকাতা অভিমুখে।

ফুলারের ভাগ্যই ফুলারকে সরিয়ে নিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত বিপ্লবীদের দেওয়া নিশ্চিত মৃত্যু উপহার হতে দূরে।

নৈহাটি পৌঁছালেন হেমচন্দ্র ও প্রফুল্ল।

কিন্তু এ কী! রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম পুলিসে গিস্‌গিস্ করছে কেন? কি ব্যাপার?

অনুসন্ধিৎসু ওরা দুজনেই। কিছু একটা রাজকীয় সমারোহ নিশ্চয়ই আছে। ব্যর্থ হলেন না ওরা। জানতে পারলেন অনুসন্ধান শেষে, লাট সাহেবের স্পেশ্যাল ট্রেন এখানে দাঁড়াবে। তাই এত সতর্কতা।

ব্যস্। ঐ তো সামনে সিদ্ধি।

সতর্ক হয়ে নেমে পড়লেন ওরা দুজনেই গাড়ী থেকে।

প্ল্যাটফর্মের দক্ষিণ দিকের লাইনের ধার ঘেঁষে খানিকটা এসে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ওরা দুজনেই।

না কারও কোন সন্দেহের কারণ হন নি।

সন্দেহ করবেই বা কে?

ওরা যে দুজন অজ্ঞ গেঁয়োর ভূমিকা নিয়েছেন তখন।

এখন শুধু অপেক্ষা।

গত দু'দিন পেটে একটি দানাও খাদ্য পড়ে নি। পায়ে জুতো নেই, জামাকাপড় বিশ্রী ময়লা, চুল দাড়ি সব মিলিয়ে চেহারার যা অবস্থা তাতে নিতান্ত পরিচিতজনেরও ভুল হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু সেজন্যে দুঃখ নেই ওদের।

সামনে রয়েছে মহতী ব্রত। এ ব্রত উদ্‌যাপিত হলে এ ক্ষুদ্র পাওয়া না পাওয়ার দুঃখ রইবে না।

অস্ত্র প্রস্তুত করলেন ওরা।

আসন্ন লগ্ন যেন বিফলে না যায়।

স্পেশ্যাল ট্রেন কোলকাতার অভিমুখে যাত্রা করলেই চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়বেন।

তারপর?

তারপর সুনিশ্চিত মৃত্যু উপহার দিতে পারবেন ফুলারকে।

নিখুঁত পরিকল্পনা।

কিন্তু এ কী! অপেক্ষার আর কাল গোনার যে আর শেষ নেই।

অবশেষে পাওয়া গেল আসল খবর।

স্পেশ্যাল ট্রেন শিয়ালদহ এল না। হুগলীর পুল পার হয়ে চলে গেল।

আবার ব্যর্থ হতে হল বিপ্লবীদ্বয় হেমচন্দ্র দাস আর প্রফুল্লকে।

ফুলার বধ সম্ভব হল না।

আবার এণ্ড্রু ফ্রেজার। পূর্ববাংলা নয়, পশ্চিম বাংলার গভর্ণর এবারের লক্ষ্য।

ফ্রেজার সাহেবের স্পেশ্যাল ট্রেন ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিলেন বিপ্লবীরা।

উনিশ শ' সাত সালের ছয়ই ডিসেম্বর নারায়ণগড়ে মাইন পাতা হল। এ মাইনগুলোও তৈরী করেছিলেন উল্লাসকর দত্ত।

মাইন পাতলেন বারীন্দ্র ঘোষ, বিভূতি ভূষণ সরকার ও প্রফুল্ল চাকী। মাইন পাতা হল। লাগান হল ফিউজ। টাইম ফিউজ। তার পর নিশ্চিত হয়ে সরে এলেন ওরা তিন জনেই।

স্পেশ্যাল ট্রেন ফ্রেজারকে নিয়ে যথা সময়ে পৌছাল নারায়ণগড়ে।

মাইন বিস্ফোরণও ঘটল, স্পেশ্যাল ট্রেনখানাও দুর্ঘটনার মুখে পড়ল। অনেকগুলো রেলকামরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু ফ্রেজারের কাল তখনও পূর্ণ হয় নি। তাই বেঁচে গেল ফ্রেজার।

আর ব্রিটিশ শাসক তোমরা ?

তোমরা তোমাদের শক্তির অহঙ্কারের পরিচয় দিতে কয়েকজন নির্দোষ রেল কুলি আর গ্যাং মানদের গ্রেপ্তার করলে। ওরা যে অসহায়! তাই অসহায় ওদের উপর নেমে এল তোমাদের প্রচণ্ড নিপীড়ন।

কিন্তু যেদিন তোমরা বুঝতে পেরেছিলে পরবর্তীকালে, সেই মুরারী পুকুরের বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হলে, যে ঐ ট্রেন দুর্ঘটনার মূলে এই বিপ্লবী দল, সেদিন বোধ হয় একবার লজ্জায় নিজের শক্তির স্পর্দ্ধাকে ধিক্কার দিয়েছিলে, তাই না ? হয়তো বা লজ্জাও পেয়েছিলে নিজেদের অপদার্থতার পরিচয় পেয়ে।

না, গভর্ণর বধ সেদিন সম্ভব হল না।

বহাল তবিয়তে বেঁচে রইলেন পূর্ব বাংলার গভর্ণর ব্যামফিল্ড ফুলার, পশ্চিম বাংলার গভর্ণর এণ্ড্রু ফ্রেজার ও রইলেন নিরাপদ দূরত্বে।

বিপ্লবীরা বুঝলেন, অত্যাচারীদের অত্যাচারের জবাব এবার সরাসরিই দিতে হবে।

প্রথম লক্ষ্য হল ম্যাজিস্ট্রেট এ্যালেন।

উনিশ শ' সাত সালের তেইশে ডিসেম্বর ম্যাজিস্ট্রেট এ্যালেন গুলিবিদ্ধ হল।

বিপ্লবীদের অব্যর্থ লক্ষ্য। শাসক শ্রেণীর অত্যাচারের জবাব দিতে গিয়ে বিপ্লবীদের হাত একবারের জন্যও কেঁপে উঠল না। অন্তরে এলনা বিন্দু মাত্র দ্বিধা।

আহত এ্যালেন। প্রাণে মরল না ঠিক, কিন্তু পঙ্গু হয়ে গেল এ্যালেন সারা জীবনের মতই।

এবারেও তোমরা ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ শাসক।

তোমার গুপ্তচর বাহিনী শতচেষ্টা সত্ত্বেও খুঁজে পেল না অত্যাচারীকে।

কিন্তু আমাদের হল বিরাট লাভ।

আমাদের নতুন বোধের উন্মেষ ঘটল।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তো বিপ্লবীনেতা অরবিন্দ বারীন্দ্রকে বললেন, A revolver is much easier than a bomb.

নতুন দৃষ্টি কোণ থেকে নেওয়া হল এবারে নতুন কার্যসূচী।

সিদ্ধান্ত নিলেন বিপ্লবী দল, ফরাসী মেয়র তার্ডিভেলকে হত্যার সিদ্ধান্ত। চন্দন নগরের এই মেয়রের কুকীর্তি তখন সমস্ত দেশ জুড়ে।

উনিশ শ' আটসালের এগারই এপ্রিল।

হেমচন্দ্র দাস, নিরাপদ রায়, উল্লাসকর, ইন্দু রায়, বারীন্দ্র ঘোষ, বিভূতি সরকার আর নরেন গোঁসাই হাজির হলেন চন্দন নগরে। ওরা সশস্ত্র। প্রস্তুত হয়েই এসেছেন।

মেয়রের বাড়ির পাশের একটা গলি ধরে এগিয়ে এলেন ওরা। অপেক্ষা করতে লাগলেন একটা নির্দিষ্ট স্থানে লগ্নের আগমনের জন্য।

প্রথম নিরীক্ষণ, তারপর এ্যাকশন।

মুহূর্তের জন্য ভুলচুক হওয়া চলবে না।

ভুল করলে ভুলের মাশুল বিপ্লবীদেরই দিতে হবে। উপস্থিত বুদ্ধি হারনো মানেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু।

অবশেষে এল শুভলগ্ন।

ইন্দুভূষণ বোমা ছুঁড়লেন ডার্ভিভেলকে লক্ষ্য করে।

ফল কি হল দেখার অবসর নেই।

এখন পালানোর পালা।

পথ—আর পথে পা দিয়েই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সরে পড়তে হবে। অন্ততঃ সব সন্দেহ হ'তে শত যোজন দূরে পৌঁছে যেতেই হবে নিরাপদ সময়ের ব্যবধানে।

হলও ঠিক তাই।

ওরা গঙ্গা পার হয়ে চলে এলেন চন্দননগর থেকে শ্যামনগরে।

সেখান হ'তে ট্রেনে সোজা শিয়ালদহ।

আর তারপর?

তারপর আবার নতুন প্রস্তুতি। নতুন এ্যাকশন।

এবার তোমার পালা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড।

অত্যাচার আর অন্যায়ের ঝুরিটা তুমি পূর্ণ করে ফেলেছ কিংসফোর্ড। এবার তোমাকে তোমার অপরাধের জবাব দিতে হবে বাংলার বিপ্লবীদের কাছে। বিপ্লবীদের বিচারালয়ে গৃহীত রায় অনুসারেই তোমাকে শাস্তি পেতে হবে কিংসফোর্ড।

কি? তোমার অপরাধ সম্পর্কে তুমি কি সচেতন নও?

বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বোধহয়।

তুমিই তো রাজদ্রোহের অপরাধে 'যুগান্তর' কাগজকে বেশ কয়েকবার, 'বন্দেমাতরম' কাগজকে একবার, আর 'নবশক্তি' কাগজকেও একবার রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করলে।

আর 'বন্দেমাতরম্' এর শুনানীর দিনে আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত উৎসুক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ই. বি. হুই—শ্বেতাঙ্গ পুলিস ইন্সপেক্টর শুরু করল লাঠিচার্জ।

পুলিসের এ ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারেনি চৌদ্দবছরের বালক সুশীল সেন।

কিশোর ছাত্র সুশীল সেন তাই নিল দৃঢ় পণ, ঐ শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষা দিয়েও ছিল সে। সিংহের বিক্রম আর অতুলনীয় মনোবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুশীল হুইয়ের উপর। উপযুক্ত শিক্ষা দিল। কুকুরের জন্য যাথার্থ মুগুড়ের ব্যবস্থা করল। কিল-চড়-ঘুষিতে পর্যুদস্ত করে তুলল সার্জেণ্টটিকে।

সমস্ত আদালত প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল।

বন্দেমাতরম্।

তোমাদের চোখে এ ধৃষ্টতা।

ব্রিটিশ বিচারালয়ের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তোমাদের ভাষায় নেটিভদের এ আচরণ ধৃষ্টতা বলেই মনে হয়েছিল সেদিন তোমাদের কাছে।

কিংসফোর্ডের নির্দেশে সুশীলকে গ্রেপ্তার করা হল।

বিচারও করলেন কিংসফোর্ডই।

তাকে পনের ঘা বেত মারবার হুকুম দেওয়া হল।

সুশীল মার খেল।

কিন্তু তোমরা সেদিন ভাবনি ব্রিটিশ শাসক এই মার আবার পাল্টা তোমাদের কাছে ফিরে আসবে।

বিপ্লবীরা প্রস্তুত হল উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্যেই।

'যুগান্তর' পত্রিকায় ঘোষিত হল শপথ বাণী ঃ

পনেরো ঘা বেতের বদলে পনেরোটা বুলেট আমরা বেছে রাখলাম, বিদেশী শাসকদের জন্যে।

এ কিন্তু কোন কথার কথা নয়, মর্ম উৎসারিত বাণী।

আর এই মর্ম উৎসারিত বাণী বাস্তবে রূপ দিতেই বিপ্লবী দল পাঠালেন ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীকে। মজঃফরপুরে।

কিংসফোর্ড মজঃফরপুরে এসেছে বদলী হয়ে।

সুশীল সেনের বেতের জবাব এবার কিংসফোর্ডকে দিতেই হবে।

এল উনিশ শ' আটসালের তিরিশে এপ্রিল।

ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ডের গাড়ী লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লেন।

বুম্-ম্-ম্···

কিন্তু বেঁচে গেল কিংসফোর্ড।

সেদিন ক্লাব ঘর থেকে কিংসফোর্ডের গাড়ীটাই ফিরে এসেছিল। কিংসফোর্ডের পরিবর্তে গাড়ীতে ছিল তুজন ইউরোপীয়ান মহিলা— মিসেস কেনেডি ও তার কন্যা।

পালাল ক্ষুদিরাম, পালাল প্রফুল্ল। তাদের বোমা নিক্ষেপের ফলাফল না জেনেই।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

ধরা পড়লেন তুজনেই।

প্রফুল্লচাকী ধরা পড়েই আত্মহত্যা করলেন। আর ক্ষুদিরাম? ব্রিটিশ বিচারক মিঃ কারণডফের রায় অনুসারে ফাঁসির হুকুম হল তার।

তৎপর হয়ে উঠল কোলকাতা পুলিস।

খানা তল্লাসি আর গ্রেপ্তারের ব্যাপকতা দেখা দিল সর্বত্র।

শেষ পর্যন্ত কোলকাতা পুলিস একটা বিশেষ সূত্র থেকে সন্ধান পেল মানিকতলা অঞ্চলের মুরারিপুকুরের একটি বাগান বাড়ির। আসলে ওটা বোমার কারখানা।

অস্ত্রশস্ত্র সহ ধরা পড়লেন বারীন্দ্র কুমার।

ধরা পড়লেন উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, কানাই লাল দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সত্যেন বসু।

বারীন্দ্র কুমার স্বীকার করলেন, লাট সাহেব বধের প্রচেষ্টা তাদেরই। তারাই পাঠিয়েছিল ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্লচাকীকে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

না আর একটি কথাও নয়।

বাড়তি কোন কথা বলে বিপ্লবের গতিকে রুদ্ধ হ'তে দিতে পারে না বাংলার দামাল ছেলের দল।

কিন্তু ভীমরতি হল নরেন গোস্বামীর।

মতিভ্রম ছাড়া আর কি? তা না হলে রাজ-সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে কেন নরেন গোঁসাই?

কেনই বা পুলিসের কাছে বলবে যে, বিপ্লবীদের সঙ্গে অরবিন্দের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

আর পুলিস কমিশনার যে 'এম্পায়ার' কাগজে বললেন, আমরা জানি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কে বা কারা জড়িত, তাদের গ্রেপ্তার করা হবে খুব শীঘ্রই, সেতো এই নরেন গোঁসাই-এর কথার উপর ভিত্তিকরেই।

নরেন গোঁসাই এর কথার উপর ভিত্তিকরেই অরবিন্দের

গ্রে স্ট্রিটের বাসায় হানা দিল ব্রিটিশ পুলিস বাহিনী মিঃ ক্রেগান আর মিঃ ক্লার্কের নেতৃত্বে।

প্রায় ছয় সাতঘণ্টা যাবৎ অরবিন্দের বাড়ি খানা তল্লাসি চালিয়ে, ক্ষমতার অপব্যবহার আর অপপ্রয়োগ করে অরবিন্দকে নিয়ে আনা হল স্থানীয় থানা ঘুরিয়ে লালবাজার। আবার সেখান হ'তে রয়েড স্ট্রীট। গোয়েন্দা পুলিস দপ্তর।

শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা শেষে একটি মূল প্রশ্নে ফিরে যাওয়া।

মিঃ ঘোষ, আপনার ব্যক্তিগত যোগাভ্যাস আর সাহিত্য সাধনার জন্য মুরারী পুকুরের বাগান বাড়ির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে স্বীকার করি। কিন্তু বোমা তৈরির জন্য বাগান বাড়ি আপনার ছোট ভাইকে ছেড়ে দেওয়া বোধ হয় উচিত হয়নি।

তীক্ষ্ণধী অরবিন্দ বুঝতে পারেন অত্যন্ত অনায়াসেই এই গোয়েন্দা পুঙ্গবটির আসল উদ্দেশ্য কী।

বাগানে আমার যেমন স্বত্ব রয়েছে, তেমনি সমান অধিকার রয়েছে আমার ভাইয়েরও। আমি বাগানে আমার ভাইকে বোমা তৈরীর সুযোগ করে দিয়েছি বা অনুমতি দিয়েছি এমন কথা আপনাকে কে বলল?

জিজ্ঞাসাবাদ তেমন আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনা গোয়েন্দা পুলিস। অতএব বৃথা রয়েড স্ট্রীটে অরবিন্দকে আঁটকে রাখা।

সন্ধ্যার পর রয়েড স্ট্রীট থেকে আবার লালবাজার।

মিঃ হ্যালিডে প্রশ্ন করলেন অরবিন্দকে সরাসরি, বোমা তৈরীর মত হীন কাপুরুষোচিত কাজে লিপ্ত ছিলেন বলে আপনার লজ্জা হওয়া উচিত—তাই না?

দপ্ করে জ্বলে ওঠেন অরবিন্দ।

তাই পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি।

আমি এ কাজে লিপ্ত ছিলাম এ কথা মনে করার আপনি অধিকার পেলেন কোথায় ?

মিঃ হ্যালিডে তবু একবার চেষ্টা করলেন, ধরে নেওয়া নয়, সবই সত্য। সমস্ত ঘটনাই আমার জানা।

আপনার জানা, না-জানায় আমি আদৌ কৌতূহলী নই।

স্থিতধী অরবিন্দের স্পষ্ট উত্তর।

হ্যালিডে নির্বাক।

জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর আশা তখন নির্মূল।'

না। জিজ্ঞাসাবাদে কোন সুফল লাভ করতে পারলে না তোমরা।

তাই বিচার হল না। অথচ নির্জন কারাবাসের হুকুম দিল তোমার শাসন-যন্ত্র।

একমাত্র উদ্দেশ্য, অরবিন্দের জীবন থেকে বাইরের সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দেওয়া।

তোমাদের অহঙ্কার আর খেয়াল খুশী চরিতার্থ করতে চাইলে, অহঙ্কারী ব্রিটিশ !

কিন্তু কোন কিছুই বিফলে যায় না।

কোন কিছুই নয় ব্যর্থ।

ব্যথা যে কখনও কখনও ফুল হয়ে ফোটে সে মাহাত্ম্য উপলব্ধ কোরবার মত মন তো তোমার কোনদিনই ছিল না ব্রিটিশ-শাসক।

শুরু হল অরবিন্দের নির্জন কারাবাস।

উনিশ শ' আট সালের পাঁচই মে।

কিন্তু এতো কারাবাস নয়, এযে বনবাস, আশ্রমবাস।

অরবিন্দ তো নিজেই লিখেছেন :

“অনেকদিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করেছিলাম। উৎকট আশা পোষণ করেছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধু ভাবে, প্রভু ভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তা দেখতে পারি নি।

“শেষে পরম দয়ালু সর্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সব শত্রুকে এক কোপে নিহত করে তার সুবিধা করলেন, যোগাশ্রম দেখালেন। স্বয়ং গুরু রূপে, সখা রূপে, সেই ক্ষুদ্র সাধন-কুটীরে অবস্থান করলেন।

“সেই আশ্রম ইংরেজের কারাগার।

“আমার জীবনের এই আশ্চর্য বৈপরীত্য বরাবর দেখে আসছি যে আমার হিতৈষী বন্ধুরা আমার যতই উপকার করুন,…শত্রুই অধিক উপকার করেছেন। তাঁরা অনিষ্ট করতে গেলেন, ইষ্টই হল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পেলাম।”

জেলখানায় দুঃখ কষ্টের তো সীমা-পরিসীমা ছিল না। যেমন কদর্য আহারের ব্যবস্থা, তেমনি পাণীয় জলের অভাব আর জেলখানার মহার্ঘ বিছানার কথা না বলাই ভাল। অথচ এ কারাগার অরবিন্দের কাছে আজ আশীর্বাদ, নির্জনতা মহিমময়। নির্জনতার বিপুল বৈভব অরবিন্দ অনুভব করেছিলেন।

“এখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়াল সঙ্গী স্বরূপ, যেন কাছে এসে ব্রহ্মময় হয়ে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হত।

“উঠোনের দেওয়ালের গায়ে একটি গাছ ছিল, কী নয়ন রঞ্জক ছিল তার নীলিমা, সেই নীলিমায় আমার প্রাণ জুড়িয়ে যেত।

“…ঘরের সামনে যে শান্ত্রী ঘুরে বেড়াত, তার মুখ যেন কতদিনের পরিচিত।

“ঘরের পার্শ্ববর্তী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সুমুখ দিয়ে গরু

চরাতে নিয়ে যেত। সেই গরু ও গোপাল ছিল আমার নিত্য দিনের প্রিয় দৃশ্য।

"আলিপুরের নির্জন কারাবাসে অপূর্ব প্রেমশিক্ষা লাভ করলাম। এখানে আসবার আগে মানুষের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতিক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল এবং পশু পাখির দুঃখে আমার মনের উৎস থেকে কোন করুণাধারা প্রবাহিত হত না।

"...কিন্তু একি হল!

সকল শ্রেণীর জীবের ওপর এত মমতা কোথা থেকে এল?

গরু পাখি এমনকি পিপীলিকা দেখেও প্রাণে এত আনন্দের শিহরণ জাগে কেন?"

এমার্সন সাহেবের অনুমতি পেয়েছিলেন অরবিন্দ।

বাড়ি হতে জামাকাপড় ও পড়বার বই আনিয়ে নিতে পারেন মিঃ ঘোষ।

চিঠি লিখলেন অরবিন্দ মেসোমশাই কৃষ্ণ কুমার মিত্রকে।

আমার জামাকাপড় ও পড়ার বইয়ের সঙ্গে গীতা ও উপনিষদ্ অবশ্যই পাঠাবেন।

বাড়ি হতে জামা কাপড় এল। এল গীতা ও উপনিষদ।

নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গী পেলেন অরবিন্দ।

শুরু হল নতুন ভাবে জীবন-সাধনা।

তারপর একদিন আর কারাবাসের-কষ্ট কষ্ট রইল না।

উপলব্ধি করলেন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

ভগবানকে উপলব্ধি করলেন অন্তরে।

মনে প্রাণে আজ প্রশান্তি।

ভয় নেই, দুশ্চিন্তা নেই, গ্লানি নেই, আছে শুধু সচ্চিদানন্দ মহৎ আত্মার উপলব্ধি।

আলিপুর।

ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বীচক্রফ্‌ট-এর এজলাস।

বিচার শুরু হল অরবিন্দের।

প্রায় একবছর পরে আজ যেন হঠাৎ বিচারের অবসর এসেছে ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠীর।

কেন? লজ্জা?

না বিনা বিচারে আর দীর্ঘকাল অরবিন্দকে কারাগারে আটকে রাখার মত মানসিক শক্তির অভাব? কোন্‌টি ঠিক?

অযথা কাল হরণ করে চেষ্টাতো চালালে এতকাল ধরে অরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ আর সাক্ষী সাবুদ সংগ্রহে।

তোমরা শাসকগোষ্ঠী নয়কে হয় করতে জুড়ি-হীন

কিন্তু কখনও কখনও এমন ছেলেমানুষি করে বস, একবারও ভেবে দেখনা—তোমাদের যুক্তি ধোপে টিঁকবে কিনা।

কি বললে? ছেলেমানুষি নয়?

বেশ্‌তো আর একবার না হয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মিঃ নর্টনের কাণ্ডকারখানা। অরবিন্দকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার কথা।

কে নর্টন?

কেন? তোমাদের পক্ষের সরকারী কৌসুঁলি ব্যারিস্টার নর্টন।

নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কি বাদ রাখল নর্টন। মিথ্যা সাক্ষী সাবুদ থেকে শুরু করে, জাল চিঠি-পত্র যেমন দাখিল করল আদালতের কাছে তেমনি আষাঢ়ে গল্পও কিছু কম ফাঁদে নি।

'কিন্তু কি লাভ হল তাতে?

শুধু দীর্ঘকাল ধরে মামলাটাকে ঝুলিয়ে রাখলে।

এই বুঝি তোমাদের সান্ত্বনা।

অরবিন্দ ভগিনী সরোজিনী দেবী অরবিন্দের আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত ব্যয় বহন করছিলেন।

জন সাধারণের কাছে সরোজিনী দেবী আবেদন করেছিলেন। সে আবেদনে সাড়াও পেয়েছিলেন। চাঁদা উঠেছিল কুড়ি-বাইশ হাজার টাকা।

পি. মিত্র, জে. এন. রায়, হেমেন্দ্র মিত্র, শরৎ চন্দ্র সেন, নরেন্দ্রন নাথ বসু প্রমুখ ব্যারিস্টাররা অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করলেন।

মামলা চলতে লাগল।

অর্থও খরচ হ'তে লাগল প্রচুর।

কিন্তু কতদিন আর তা সম্ভব? দীর্ঘ মোয়াদী মামলা চালাবার ক্ষমতা আর তার রইলনা। নিঃস্ব হয়ে পড়লেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন বাঘা বাঘা ব্যারিস্টাররা।

এবার কৃষ্ণ কুমার মিত্র প্রস্তাব করলেন, চিত্তরঞ্জন দাশকে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিলে মন্দ হয় না।

কিন্তু বয়স যে ভীষণ অল্প। খুঁত খুঁত করতে থাকে ভূপাল বাবুর মনটা।

ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকেই মামলার দায়িত্ব দিলেন ভূপাল বাবু।

কিন্তু কোন ফল হল না। নিরুৎসাহ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীও। কাজে উদ্যমের বড় অভাব।

কৃষ্ণ কুমার মিত্র, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী—ওরা চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করলেন।

আপনি এ মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিন। অবশ্য আপনাকে বেশী ফী দেওয়ার মত সমর্থ আমাদের নেই।

ভাবলেন চিত্তরঞ্জন। অর্থই কি তার জীবনের একমাত্র কামনার সামগ্রী? আর কিছু কি নেই? নেই কি দেশের প্রতি কর্তব্য।

বললেন, ফী আপনাদের দিতে হবে না। আমিই এ মামলা পরিচালনা করব।

অবাক! বিস্ময়ে হতবাক ওরা সকলেই।

চিত্তরঞ্জনের তখন মাসিক আয় প্রায় পাঁচহাজার টাকা।

সেই চিত্তরঞ্জন, ওকালতিই যার পেশা, তিনি বলেন কিনা বিনা পারিশ্রমিকে মামলা পরিচালনা করবেন।

অবাক হবারই কথা!

চিত্তরঞ্জন এলেন অরবিন্দের মামলা পরিচালনা করতে।

মিঃ নর্টন দাখিল করলো আদালত সকাশে অরবিন্দের লেখা একটা চিঠি। স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে অরবিন্দ লিখেছিলেন এ চিঠি:

"অনেকদিন যাবৎ তোমার নিকটে কোন পত্র লিখি নাই। ভগবান আমাকে যেখানে লইয়া যান, সেখানেই যাই। এখন আমার নিজের কোন কাজ নাই, ভগবানের কার্যে আমি সর্বদাই ব্যস্ত আছি। আমার মানসিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তিনি আমাকে যাহা আদেশ করেন আমি তাহাই করি, আমার নিজের কোন ইচ্ছা নাই। ঈশ্বর তোমাকেও দয়া করিবেন, তোমার পথ দেখাইয়া দিবেন। তুমি আমার সহধর্মিনী, তুমি কি আমার কার্যের সহায় হইবে না?

"প্রতিদিন অন্ততঃ আধঘণ্টা ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন কর। তিনিই তোমাকে শক্তি দিবেন। আমার মন্ত্র সম্বন্ধে কাহাকেও বলা নিষেধ, এমনকি তোমাকেও বলা যায় না। তবে এখন আমি গুরুর আদেশ পাইয়াছি, এখন তোমার কাছে উহা ব্যক্ত করিব। তুমি ভিন্ন আর কাহাকেও একথা বলি নাই, বলিতে পারা যায় না। আমি আজ মাছ মাংস ছাড়িয়া দিয়াছি। বোধ হয় জীবনে আর কখনও উহা স্পর্শও করিব না। কিন্তু ন-মাসী আমার কথা শুনিবেন কেন? এই জন্য আমি তাঁহার বাড়িতে উঠিতে চাই না···দেশের মুক্তির জন্য একমাত্র ব্রহ্মতেজই প্রয়োজন হইয়াছে—"

চমৎকার তোমাদের যুক্তি ব্রিটিশ-শাসক।

মিঃ নর্টন বললে, এ চিঠিতে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয় এ চিঠি পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায় অরবিন্দ তার স্ত্রীকেও এই সমিতির নানা কার্যে যোগদান করতে অনুরোধ করছেন।

অথচ তোমরা কোথাও খুঁজে পেলে না এর মধ্যে ধর্মীয় ভাবের কথা। আসলে অরবিন্দের মন যে তখন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল সমধিক, সেই আকুতিই তো প্রকাশ পেয়েছে এ চিঠিতে।

চিত্তরঞ্জনের বক্তব্য, ওটা ধর্মীয় চিঠি। সেখানে রাজনীতির গন্ধ নিয়ে আনা অনভিপ্রেত।

যুক্তি দিলেন, ব্যাখ্যা করলেন হিন্দুধর্মের তাৎপর্য। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দিলেন চিত্তরঞ্জন। ব্যাখ্যা করলেন 'ব্রহ্মতেজ'।

মিঃ নর্টন এবার দ্বিতীয় আর একখানা চিঠি দাখিল করলেন কোর্টে।

তার ভাষায় অমোঘ বাণ।

অরবিন্দের দোষ প্রমাণে যা অতুলনীয়।

Dear Brother,

We must have sweets all over India, ready made for imergency. (emergency)

I wait here for your answer.

Yours,

Barindra Kumar Ghosh.

মিঃ নর্টন পড়লেন এ চিঠি।

স্পষ্ট তার বক্তব্য: চিঠিতে উল্লিখিত সন্দেশ বোমা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

চিত্তরঞ্জন বোধ হয় ক্ষণিকের জন্য দ্বিধাচিত্ত।

তারপরেই তিনি তার বক্তব্য রাখলেন।

এ চিঠি জাল, মি লর্ড। পুলিস তার অসৎ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য এ চিঠি তৈরি করেছে। পুলিসের কথায় যদি ধরে নেওয়া যায় বারীন্দ্র কুমার এবং অরবিন্দ দুজনেই তখন সুরাটে ছিলেন, তাহলে এমন একটা জরুরী চিঠি বারীন্দ্র ডাকে পাঠাবেন কেন?

মি লর্ড, বারীন্দ্র কুমার সব সময় অরবিন্দকে সেজদা সম্বোধন করতেন, হঠাৎ এ চিঠিতে Dear Brother সম্বোধন করবেন এ কল্পনায় আনা যায় না।

তা ছাড়া কোন বিপ্লবী কখনই এমন জরুরী চিঠিতে নিজের পুরোনাম লেখেন না হয়তো বা সংক্ষিপ্ত নাম বা কোন চিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন। সেটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বারীন্দ্র কুমারের পুরোনাম সন্দেহ জাগায় কারণ তা ওদের রীতি বিরুদ্ধ।

পুলিসের বক্তব্য, চিঠি খানা গ্রে স্ট্রীটের বাড়ি খানা তল্লাসির সময় পাওয়া গেছে। যদি তা-ই হয় তাহলে অরবিন্দ তো এ চিঠি অনেক দিন আগেই পেয়েছেন। এমন একটা জরুরী অথচ সর্বনাশা চিঠি তিনি বিপ্লবী হয়েও নষ্ট করবেন না সঙ্গে বয়ে বেড়াবেন প্রমাণ হিসেবে এমন কল্পনা বাতুল ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। কারণ সুরাটে তিনি এ চিঠি পেলেন যদি ধরে নেওয়া হয় তাহলে তারপর তো তিনি সুরাট থেকে এলেন বোম্বে—বোম্বে থেকে কোলকাতা, কোলকাতার স্কটলেন হ'তে গ্রে স্ট্রীট—এতগুলো স্থান পরিবর্তন সত্ত্বেও তিনি চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছেন এও কি সম্ভব?

চিঠির মধ্যে দু একটা বানান ভুল আছে। ধরা যাক এমারজেন্সি বানান, বারীন্দ্র কুমারের মত শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এত সহজ বানান ভুল করা অসম্ভব।

চিঠি প্রাপ্তি সম্পর্কে পুলিসের অফিসারের সাক্ষ্যদানও অস্বাভাবিক। সুতরাং এ চিঠি জাল।

বিচারক মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌ট মেনে নিলেন চিত্তরঞ্জনের যুক্তি।

চিত্তরঞ্জন বললেন,

রাজনীতি ক্ষেত্রে অরবিন্দ যেটুকু করেছেন সেটুকু বে-আইনী নয়। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করেছেন অরবিন্দ। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার কি কখনও বে-আইনী হতে পারে? পারে না। দেশপ্রেম অপরাধ নয়।

মিঃ বীচ্‌ক্রক্‌ট মেনে নিলেন চিত্তরঞ্জনের যুক্তি।

একদিনের সহপাঠী মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌ট সহপাঠী অরবিন্দের বিচারকের আসনে বসে কিন্তু প্রশয় দেন নি কোন দুর্বলতা।

রায় বেরুল। প্রমাণিত হল অরবিন্দ নির্দোষ।

উনিশ শ' নয় সালের পাঁচই মে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি!

এ মুক্তি নির্জন কারাবাস হ'তে।

এ মুক্তি ভূমার উপলব্ধি শেষে।

দেশবাসী অরবিন্দের মুক্তিতে আনন্দে উদ্বেল।

কিন্তু সে আনন্দে সাড়া দিতে পারছেন না কেন অরবিন্দ?

সে কী তার জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্কোচন লক্ষ্য করে।

নেতৃবর্গের অনেকেই ব্রিটিশ বন্দীশালায়, অনেকেই দ্বীপান্তরে।

এই নেতৃবর্গের কেউ কেউ বা সরেও পড়েছেন আদর্শ বিসর্জন দিয়ে।

তিলক কারাগারে; কৃষ্ণ কুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখেরা নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত; বিপিন চন্দ্র পাল বিলেতে। একমাত্র ডাঃ মুঞ্জে, মতিলাল ঘোষ প্রমুখেরা জাতীয় দলের আদর্শ নিয়ে কোনক্রমে টিকে আছেন এখনও!

আসলে সেদিন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার আর নিপীড়নের ভয়ে দেশবাসী জাতীয় দলকে বা জাতীয় দলের আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করলেও সরাসরি যোগ দিতে পারছেনা সে আদর্শে। অংশ নিতে পারছেনা দেশ সেবায়।

জাতীয় দলের মুখপাত্র দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। অরবিন্দ তখন কারাগারেই। সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে বন্দেমাতরম্-এর ছাপাখানা। যুগান্তর, সন্ধ্যা, নবশক্তি— এগুলোও বারবার রাজকোষের কবলে পড়ে আজ একেবারে নিশ্চিহ্ন।

অরবিন্দ চঞ্চল, অরবিন্দ বিহ্বল।

শুষ্ক খাতে কি করে তিনি নদীর পরিপূর্ণ যৌবন-উচ্ছলতা নিয়ে আসবেন? অথচ আনতে তো তাকে হবেই।

মন স্থির করে ফেললেন।

নতুন করে আবার কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিবেন তিনি। গ্রহণ করবেন নূতন কর্মসূচী।

হৃদয়ে উপলব্ধ নতুন তত্ত্বজ্ঞান, নতুন ঐশীবাণী তিনি শোনাবেন দেশবাসীর কানে কানে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে আবার জাতীয় আন্দোলন শুরু হ'বে।

হিংসা নয়, অহিংসা; কলহ নয়, প্রেম; ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ীই দেশ সেবায় ব্রতী হওয়াই হবে এ নব আন্দোলনের মূল মন্ত্র।

তার নব নীতি প্রচারের বাহন হল 'ধর্ম' ও 'কর্মযোগিন' সংবাদ-পত্র দ্বয়—একটা বাংলা, অপরটা ইংরাজী।

কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবাসী তখন বিভ্রান্ত।

ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টো মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের প্রবর্তন করলেন।

উনিশ শ' নয় সালের কথা।

কী দয়া ওদের !

ভারতের জনগনের শান্তি ব্যাহত। আর এই ব্যাহত শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যই এই মর্লি-মিণ্টো সংস্কার। ওদের চোখে যেন ঘুম নেই ভারতের জনগনের শান্তি ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত।

এই নব প্রবর্তিত সংস্কারে বলা হল, ভারতীয় জনগনকে শাসনকার্যে সহযোগিতার সুযোগ দেওয়া হবে।

আর তাতেই ভুলে বসল সব কিছু মধ্যপন্থী দল—সেকালীন রাজনীতির কর্ণধারেরা।

কিন্তু এর মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সৃষ্টিকারী সর্বনাশা বীজ নিহিত আছে তা মধ্য-পন্থী নেতৃবর্গের চোখ এড়িয়ে গেল।

সুরেন্দ্র নাথ বা গোখেলের মত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরও যেন অবসর নেই বিষয়টি সম্পর্কে তলিয়ে আলোচনা করার। এত শ্রম স্বীকার করবেনই বা কেন ? বাইরের আপাতঃ মধুর সম্ভাবনা দেখেই ওরা বিমুগ্ধ।

নতুন শাসন-সংস্কার ভারতের কী মহৎ উপকারই না করল ! উপকার নয়, স্বাধীনতা লাভের পথে একটা বিরাট অচলায়তন সৃষ্টি করলে তোমরা।

হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হল।

সুতরাং হিন্দু হিন্দুর জন্য, মুসলমান শুধু মাত্র মুসলমানের—এই বোধটুকু তো তোমরা জাগালে ভারতবাসীর মনে অত্যন্ত সহজেই।

এ-ইতো হল মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের সোনার ফসল।

ভারতের জাতীয় শক্তিকে পঙ্গু করে দেওয়ার কী সহজ সুযোগ !

অরবিন্দ বুঝতে পেরেছিলেন এই সংস্কারের ত্রুটি।

অতএব তিনি চাইলেন, এই সংস্কারের ভাবী ফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে দিতে।

এ দায়িত্ব তাকে নিতেই হবে।

তিনি লিখলেন এ সম্পর্কে 'কর্মযোগিন্'-এ, লিখলেন 'ধর্মে'ও।

কিন্তু দুর্ভাগ্য অরবিন্দের!

দুর্ভাগ্য দেশবাসীর!

মধ্যপন্থী নেতৃবর্গ জনসাধারণকে সঠিক পথ খুঁজে পেতে দিতে চায়না। তাই রাজনীতির কূট চক্রান্তে জনসাধারণ বিভ্রান্ত, কুয়াসাচ্ছন্ন।

ভেদনীতি সৃষ্টিকারী মর্লিমিণ্টো সংস্কারই আপাততঃ তাই সাধারণের কাছে মনে হল পরমার্থ!

কিন্তু কত কাল আর আফিমের নেশায় বুঁদ করে রাখা যায় মানুষকে।

খুব বেশীদিন সময় লাগল না মধ্যপন্থী দলের অপকৌশল ব্যর্থ করতে।

উনিশ শ' নয় সালের সেপ্টেম্বর।

কংগ্রেস প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন বসবে হুগলীতে।

মধ্যপন্থী নেতৃবর্গ খসড়া প্রস্তুত করলেন অধিবেশনের প্রস্তাবের।

কিন্তু এ কী!

এ যে জাতীয় দলের আদর্শের পরিপন্থী!

প্রতিনিধি নির্বাচনে তরুণ সম্প্রদায় যোগ দিতে পারবে না।

আহা! কি জন-দরদ!

অরবিন্দ যেন নির্বাচিত হতে না পারেন সে চেষ্টাও কম চালালেন না মধ্যপন্থী নেতৃবর্গ।

এ কী অন্যায়!

অরবিন্দ কিন্তু সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে নির্বাচিত হলেন ডায়-মণ্ডহারবার থেকে।

প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন অরবিন্দ।

ছাত্র-সম্প্রদায়কে, তরুণ-সম্প্রদায়কে রাজনীতিতে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়ে প্রচার-পত্র ছাপালেন অরবিন্দ ; একুশ বছরের গণ্ডিটা কোন বাধাই হ'তে পারে না।

হুগলীর জাতীয় দলকে নির্দেশ দিলেন তিনি, ছাত্রদের নিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে জাতীয় দল অধিবেশনে যোগ দেবে। অভ্যর্থনা সমিতির নিষেধ কোন কারণেই মেনে নেওয়া চলে না।

অরবিন্দ আরও একটা দায়িত্ব নিলেন, অভ্যর্থনা সমিতি প্রচারিত প্রস্তাবের পাশাপাশি জাতীয় দলের প্রস্তাবও তিনি রাখলেন। ছাপালেন, পৌঁছে দিলেন জাতীয় দলের প্রতিনিধিদের হাতে।

আর তারপর?

তারপর প্রচার পত্র সহ জাতীয় দলের প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দিয়ে হাজির হলেন সম্মেলনে।

প্রচার পত্র বিলি করা হল সম্মেলনে।

প্রতিনিধি বর্গ কিন্তু এখন অরবিন্দের পক্ষে।

বিপুল সমর্থনে গৃহীত হল অরবিন্দের প্রস্তাব সমূহ।

আর মধ্যপন্থী দল?

ওদের জন্য রইল জনসাধারণের ধিক্কার বাণী।

দেশের এক প্রান্ত হতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে অরবিন্দ বুঝতে পারলেন দেশবাসী এখন গভীর অবসাদে মগ্ন।

একদিকে বিপ্লব—ইংরাজ হটাও। আর অন্যদিকে শাসন কায়েম করার জন্য প্রচণ্ড দমন নীতি।

বরিশালের ঝালকাঠিতে বক্তৃতা করতে এসে অরবিন্দ বললেন,

"আমাদের স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্য—আমাদের জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, ধর্মকে পাওয়া। স্বরাজ বলতে এই বুঝায় না যে, দেশবাসী ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, দেশময় সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করবে, বা বোমা রিভলবারে দেশ আচ্ছন্ন করে দেবে। স্বরাজ অর্থ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন বা অন্য কোন প্রকার শাসন-ব্যবস্থা নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণতা লাভই স্বরাজের আদর্শ। হিংসার পন্থা এই স্বরাজের পথ নয়। শিক্ষা, বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা—সবরকম জাতীয় অনুষ্ঠানেই আমাদের স্বদেশী মন্ত্র গ্রহণ করে জাতীয় বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখতে হ'বে। প্রত্যেক জাতি তার ন্যায্য অধিকার লাভ করবেই—এটা বিধাতার বিধান। কোনও রাজশক্তির সাধ্য নেই সে বিধানে বাধা দেয়। নির্যাতন আসবেই, কিন্তু আত্মশক্তিতে আস্থাবান হয়ে সেই নির্যাতনে টিকে থাকবার মত শক্তি অর্জন করতে হবে"

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার আধ্যাত্মিক বাণী শোনার মত মানসিক প্রস্তুতি সাধারণের নেই।

অতএব আর কর্মক্ষেত্র নয়, এবারে গভীর সাধনা, নিজেকে গঠন করার সাধনা।

আশ্রম জীবন এখন অরবিন্দকে বড় বেশী আকর্ষণ করে।

না, এ আকর্ষণের পেছনে রাজনৈতিক ঝড় ঝাপ্টা কোন কার্যকরী ভূমিকা নেয়নি।

রাজরোষ তাকে রাজনীতি হ'তে দূরে সরিয়ে নিতে পারেনি।

তিনি তো মনে প্রাণে প্রস্তুতই ছিলেন, ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর দেওয়া যে কোন অত্যাচার আর নিপীড়ন সহ্য করার জন্য।

প্রমাণ?

প্রমাণ 'ধর্ম' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ।

"আমাদের পুলিস বন্ধুগণ রটনা করিয়াছেন যে, আবার নির্বাসনরূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবে। এইবার নয় জন নহে, চব্বিশ জনকে—মোটরকারে, রেলে Guide-জাহাজে গবর্ণমেণ্টের খরচে নানা প্রদেশ ও বিবিধ জেল ঘুরিয়া আসিবার জন্যে প্রস্থান করিতে হইবে। পুলিসের এই তালিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ নাকি প্রথম নম্বর পাইয়াছেন।

আমরা কখনও বুঝিতে পারি নাই নির্বাসন এমন কি ভয়ঙ্কর জিনিস যে, লোকে নির্বাসনের নাম শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া দেশের কার্য, কর্তব্য, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ পূর্বক কম্পিত কলেবরে ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িবে। চিদাম্বরম্ প্রভৃতি কর্মবীর বয়কট প্রচার অপরাধে যে কঠিন দণ্ড হাসিমুখে শিরোধার্য করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই লঘু দণ্ড অতি অকিঞ্চিৎ কর।

বাহিরে পরিশ্রম করিতেছিলাম, নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে দেশ সেবা করিতেছিলাম; না হয় ভগবান লর্ড মিণ্টো ও মর্লিকে যন্ত্র করিয়া বলিলেন, যাও, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, নির্জনে আমার চিন্তা কর, পুস্তক পড়, পুস্তক লিখ, জ্ঞান সঞ্চয় কর, জ্ঞান বিস্তার কর। জনতায় থাকার রস আস্বাদন করিতেছিলে, নির্জনতার রস আস্বাদন কর।

ইহা এমন কি কথা যে ভয়ে কাতর হইতে হয়? কয়েকদিন প্রিয়জনের মুখ দেখিতে পাইব না—বিলাতে বেড়াইতে গেলেও তাহা

হয়, অথচ লোকে বিলাতে বেড়াইতে যায়। ধরুন অখাদ্য খাইয়া গ্রীষ্ম ও শীতে কষ্ট পাইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বাড়িতে বসিয়াও রোগের হাত হইতে নিস্তার নাই; বাড়িতেও অসুখ হয়, মরণ হয়; অদৃষ্ট লিখিত আয়ুঃক্রম কেহ অন্যথা করিতে পারে না। আর হিন্দুর নিকট মরণে ভীষণতা নাই। দেহ গেল, পুরাতন বস্ত্র গেল; আত্মা মরে না। সহস্রবার জন্মিয়াছি, সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিব। ভারতের স্বাধীনতা না হয় স্থাপনা করিতে পারিলাম না, ভারতের স্বাধীনতা ভোগ করিতে আসিব; কেহ আমাকে বারণ করিতে পারিবে না। এত ভয় কিসের? সস্তায় ইতিহাসে অমর নাম লিখাইলাম, স্বর্গের পথ উন্মুক্ত অথচ কষ্ট নাই। সামান্য শরীর-ক্লেশে মুক্তি-ভুক্তি পাইলাম। এইতো কথা। টান্সভালের কুলীদের মহৎ ভাব এবং ভারতের শিক্ষিত লোকের এই জঘন্য কাতর ভাব দেখিয়া লজ্জিত হইতে হয়।”

ভারতের স্বাধীনতা আসবেই, এ বিশ্বাস তিনি করতেন:

“চব্বিশ জনকে নির্বাসন করুন বা একশ জনকে নির্বাসন করুন, অরবিন্দ ঘোষকে নির্বাসন করুন বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে নির্বাসন করুন, কালচক্রের গতি থামবার নয়।”

কালচক্রের গতিই হয়তো বা অরবিন্দকে নিয়ে চলল রাজনীতি-ক্ষেত্র হতে বহুদূরে।

হয়তো বা তা-ই ভগবানের অভিপ্রেত।

উনিশ শ' দশ সালের মার্চে কোলকাতা ছেড়ে যাত্রা করলেন অরবিন্দ। উদ্দেশ্য চন্দননগর।

তারপর?

তারপর সেখান থেকে পণ্ডিচেরী।

৪ঠা এপ্রিল অরবিন্দ পণ্ডিচেরী এলেন।

গেলেন তার যোগসিদ্ধির নির্দিষ্ট স্থান।

আর কর্ম?

সে জন্য তিনি ভাবেন না। বিশ্বাস করেন তার কর্মের পরিধি হবে বাংলা ছেড়ে সারা ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ ছেড়ে সমগ্র পৃথিবী।

কিন্তু কেন চন্দন নগর?

কেনই বা পণ্ডিচেরী?

কোলকাতা পুলিসের ডি. এস. পি—গোয়েন্দাদলের সর্দার শামসুল আলমকে খুন কোরল বিপ্লবী দুই যুবক কোলকাতার হাইকোর্টের সিঁড়িতে। একজন বীরেন দত্তগুপ্ত আর অন্যজন রাজসাহির সতীশ সরকার।

আলিপুরের বোমার মামলার প্রধান তদবিরকার শামসুল আলম—তুমি চাইলে ইংরেজ সরকারের সুনজরে থেকে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে।

তোমাকে বিপ্লবীরা ক্ষমা করবে কেন?

যদি বল তুমি তোমার কর্তব্য করেছ মাত্র। আনুগত্য দেখিয়েছ সরকারের প্রতি, এবং আনুগত্য দেখানোই তোমার প্রধান কর্তব্য। তাহ'লে বিপ্লবীরাও বা তাদের পথের কণ্টক সরিয়ে দিয়ে তাদের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করে নেবেই না বা কেন?

তখন আলিপুরের বোমার মামলার আপিল চলছিল হাইকোর্টে।

অতএব শামস্থলকে নিয়মিত যাতায়াত করতে হ'ত হাইকোর্টে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে শামস্থল।

একটা যুবককে সিঁড়ির পৈঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে লক্ষ্যও করেছিল শামস্থল।

কিন্তু অমন কত ছেলেই তো দাঁড়িয়ে থাকে এখানে ওখানে।

আমল দেয় নি শামস্থল।

শামস্থলের আয়ু তখন ফুরিয়ে এসেছে, আমল দেবেই বা কেন?

গুলি চালাল বীরেন।

দ্রাম্।

একটি মাত্র গুলি।

তাতেই ইহজন্মের মত শামস্থলের আলিপুরের বোমার মামলার তদবির করার বাসনা ফুরিয়ে গেল।

আর বীরেন?

বীরেন তখন মরিয়া। তাই ভুলে গেছে সে তার পরবর্তী কর্তব্য।

সতীশ সরকার পূর্ব নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুযায়ী একটা ভাড়া-করা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে বীরেনের প্রত্যাবর্তনের জন্য শামস্থলকে গুলি করার পর থেকেই।

কিন্তু মনে নেই বীরেনের কর্তব্য সমাধা শেষে পলায়নের কথা।

উত্তেজিত বীরেন ক্রমাগত গুলি ছুঁড়ছেই।

কিন্তু কতক্ষণ আর ?

গুলি ফুরিয়ে গেল অবশেষে। ধরা পড়ল বীরেন।

শুরু হল পুলিসি নিপীড়ন।

কিন্তু বীরেনের একই উত্তর, কিছুই বলব না।

বীরেনকে আনা হল আদালতে।

সেখানেও সেই একই উত্তর। কোন উত্তর দিতে রাজী নই। তোমাদের যা ইচ্ছে শাস্তি দিতে পার।

মাত্র আঠার বছরের বালক। অথচ জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই আদালতে দাঁড়িয়ে বিচারপতি নিযুক্ত ব্যারিস্টার নিশীথ সেন, যাকে আসামীর পক্ষে জেরা করতে অনুরোধ করেছিলেন বিচারপতি, তাকে অনায়াসে ফিরিয়ে দিল বীরেন।

বীরেনের আজ কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

একমাত্র লক্ষ্য পূরণ হওয়ায় সে যেন আজ সকল চাওয়া-পাওয়ার উত্তরে।

বিচার হল। রায়ও বেরুল।

বিচারে বীরেনের ফাঁসিই হল।

এ রায় অবশ্য সকলেরই জানা। তাই বিস্ময়ের কিছু নেই।

কিন্তু ব্রিটিশ পুলিস তখন সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে, হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় অরবিন্দকে জড়াতে হবে। কারণ একটা বিরাট মনীষা ও অধ্যাত্ম শক্তিকে জেলখানার বাইরে বেশী দিন থাকতে দেওয়া সমীচীন নয়।

ভগিনী নিবেদিতা এ খবর পেলেন কোন একটা সূত্র থেকে।

হাজির হলেন অরবিন্দের গ্রে স্ট্রীটের বাসায়।

পালান, দেরি করবেন না বিন্দুমাত্র।

হ্যাঁ, বিবেকানন্দের মানসকন্যা, লোকমাতা নিবেদিতাই সেদিন পালাবার নির্দেশ দিলেন অরবিন্দকে।

বরোদায় প্রথম আলাপ হয়েছিল অরবিন্দ নিবেদিতায়।

নিবেদিতা বলেছিলেন, বাংলাই আপনার কর্মক্ষেত্র। কোলকাতায় আপনার ভীষণ প্রয়োজন।

অরবিন্দ বলেছিলেন, কিন্তু আমার তো একমাত্র লক্ষ্য মানুষের মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা। আমার কর্মক্ষেত্রে তো প্রকাশ্যে নয়, নেপথ্যে।

নিবেদিতা-অরবিন্দে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল সেই ক্ষণে। দু'জনেই দু'জনকে চিনতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন, একই তাদের ব্রত। একই মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে।

নিবেদিতা বললেন, আমি আপনার দলের মানুষ। আপনার সহকর্মী। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন অনায়াসে।

বিশ্বাস করেছিলেন অরবিন্দ।

তাই অনায়াসে 'কর্মযোগিন্' প্রকাশনার ভার নিবেদিতার উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি রওনা দিলেন চন্দননগর। চন্দননগর ছেড়ে পণ্ডিচেরী।

আশ্রম গড়ার দিকে মন দিলেন অরবিন্দ।

অরবিন্দের সঙ্গে এলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও বিজয়কুমার নাগ। আর তারই কিছু দিন পর নলিনীকান্ত গুপ্ত চলে এলেন, এলেন সৌরীন্দ্রনাথ বসুও।

কিন্তু আশ্রম গড়তে চাইলেই তো আর রাতারাতি তা গড়ে ওঠে না।

বাধাও এল প্রচণ্ড। আশ্রম গড়ার অন্তরায় হল দু'টি।

প্রথম অন্তরায় আর্থিক।

আশ্রম তৈরি করে সেই আশ্রম সুষ্ঠুভাবে চালাতে তো বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এ বিপুল অর্থ তিনি পাবেন কোথায়?

অরবিন্দ আর্থিক অভাবের কথা ভাবেন না। তিনি জানেন, তিনি শুধু কাজ করবেন। আর ভাবনা ভাববেন তিনিই যাঁর প্রেরণায় তিনি কর্মযজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন।

কী আশ্চর্য!

আর্থিক অস্বচ্ছলতায় বন্ধ হল না আশ্রমের গঠন কাজ। টাকা আসতে লাগল আশ্রমে। কেউ বা স্বেচ্ছায়, কেউ বা দৈব প্রেরণায়, কেউ বা অরবিন্দের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েই—সাহায্য করতে লাগলেন অরবিন্দের গঠন কার্য্যে।

অর্থ সাহায্য এসে পৌঁছাল অযাচিত ভাবেই।

আর দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল ব্রিটিশ গোয়ান্দা বিভাগের হায়েনা চোখ।

ওরা সতর্ক। ভয়ঃ হয়তো বা অরবিন্দ ব্রিটিশ রাজত্বের বাইরে ফরাসী রাজত্বের অধীনস্থ পণ্ডিচেরীতে বসে গোপনে গোপনে বিপ্লবটাকে জাঁইয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। ওদের বিশ্বাস, অরবিন্দের পক্ষে আন্দোলন চালানো সুবিধাই হবে ব্রিটিশ রাজত্বের বাইরে এসে।

ভয় পেয়েই তো তুমি বদান্য সরকার দায়ের করলে মামলা অরবিন্দের প্রকাশিত লেখার বিরুদ্ধে। 'কর্মযোগিনে'র এ লেখাটায় কত অনায়াসে রাজদ্রোহিতার লেবেল এঁটে দিলে।

এমন কি তোমার বদান্যতায় পত্রিকার মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষের ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশও বের করলে নিম্ন আদালত হ'তে।

কিন্তু তা ধোপে টিকল না।

হাইকোর্টে আপীল করা হল। আর অত্যন্ত সহজেই প্রমাণ করা গেল তোমাদের ভাষায় রাজদ্রোহী মূলক প্রবন্ধটা আদপে রাজ-দ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী নয়।

তাই বাধ্য হলে মনোমোহন ঘোষকে মুক্তি দিতে।

হার মানলে অরবিন্দের প্রচারিত আদর্শের কাছে।

উনিশ শ' ছাব্বিশ সাল।

ছাব্বিশে নভেম্বর।

সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলেন শ্রীঅরবিন্দ।

আর আশ্রমের গঠন মূলক কাজে আত্মনিয়োগ নয় এবারে শুধু নির্জন সাধনা।

আশ্রম পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল মীরা রিচার্ডের উপর। একজন ফরাসী বিদূষী।

কিন্তু বিচিত্র জীবনের অধিকারিণী মীরা রিচার্ড অরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিচেরী আশ্রমের সব দায়িত্বই আপনার মস্তকে তুলে নিলেন।

আর তিনি নতুনভাবে পরিচিত হলেন আশ্রমবাসীদের কাছে। ভারতবর্ষ তাকে জানল নতুন রূপে। বিশ্ব তাকে জানল নতুন নামে।

মীরা রিচার্ড আজ পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীমা।

অরবিন্দ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন ?

কিন্তু সাধনার লক্ষ্যটি ?

সে সম্পর্কে তিনি তার মা বইয়ে লিখেছেন ঃ

"অতি মানস রূপান্তর নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে আছে, পৃথ্বী চৈতন্যের ক্রমবিবর্তনে তা অনিবার্য কারণ, এই চেতনার উর্ধ্বমুখী গতি শেষ হয় নাই ; মন তার সর্বোচ্চ শিখর নয়। কিন্তু পরিবর্তনটি যাতে আসতে পারে, রূপ গ্রহণ করতে পারে, চিরস্থায়ী হতে পারে সেজন্য প্রয়োজন। প্রথম অধঃ হতে আহ্বান এবং সেই সাথে উর্ধ্বের জ্যোতিঃ যখন এসে প্রকট হয় তখন তাকে অস্বীকার না করে স্বীকার করবার দৃঢ় সংকল্প, আর প্রয়োজন, উপর হতে ভগবানের অনুমতি। যে শক্তি উর্ধ্বের অনুমতি আর নিম্নের আহ্বান এই দুয়ের মধ্যবর্তী হয়ে উভয়ের আদান-প্রদান ঘটায় তাই ভাগবত জননীর সত্তা ও শক্তি। কোন মানবীয় প্রয়াস বা তপস্যা নয়, এক মায়েরই শক্তি আবরণ-খানি ছিন্ন করতে পারে। আধারকে গড়ে তুলতে পারে, এই তমিস্রার মিথ্যার মৃত্যুর বেদনার জগতে নামিয়ে আনতে পারে সত্যজ্যোতিঃ, দিব্য জীবন, অমরের আনন্দ।

অরবিন্দ চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক বিপ্লব।

এখানেও তো অরবিন্দ বিপ্লবী। রাজনৈতিক বিপ্লবের তুলনায় এ বিপ্লব কোন অংশে কম ?

কিন্তু কেন এই আধ্যাত্মিক বিপ্লবের ভাবনা ?

বারীন্দ্র কুমার তো লিখেছিলেন অরবিন্দ সম্পর্কে, দেবতা নন, অনেক পিটিয়ে শানান লোহা।

দেবতা তো কেউই নন, তবে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই দেবতা

আছেন তাঁকে প্রকট করে তোলাই তো দেব জীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে পারে।

অবিশ্বাসই বোধ হয় অরবিন্দকে ঠেলে দিয়েছিল আধ্যাত্মিক বিপ্লবের পথে।

অরবিন্দ নিজেই লিখেছেন ঃ

ভগবান তাঁর জগৎকে এমন দারুণ হাতুড়ী পেটা করেন কেন, ময়দার তালের মত তাকে দলেন পেষেন কেন, কেনই বা তাকে এত বার রক্তস্নান করান, নরকে প্রজ্বলিত অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষেপ করেন ?

কারণ সমষ্টি হিসাবে সাধারণ মানুষ এখনও যেন একটা কঠিন মলিন হীন খনিগর্ভস্থ ধাতু—তাকে গলাতে হলে, এ ছাড়া কোন উপায় নাই। যেমন তাঁর উপকরণ, তেমনি তার কর্মপদ্ধতি। উপকরণ শুদ্ধতর মহত্তর পদার্থে রূপান্তরিত হওয়ার জন্যে উন্মুখ হোক তবে তার সাথে ভগবানের ব্যবহার রীতিও হবে মৃদুতর, মধুরতর, আর মহত্তর ও সুন্দর তর, সার্থকতাও তাদের আসবে।…

মানুষ একবার যদি আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতে সম্মত হয়, তবে সব পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মনোরম প্রাণময় প্রকৃতি উর্দ্ধতর ধর্মের বিরোধী। সে তার অপূর্ণতাকেই ভালবাসে।

তিন রকম বিপ্লবের সঙ্গে জগতের পরিচয়, স্থূল ভৌতিক বিপ্লব—প্রবলতার ফল সব ; মানসিক ও নৈতিক বিপ্লব তার পরিসর বহুগুণে বেশী ব্যাপক, ফলও বহুমুখী ; কিন্তু এক আধ্যাত্মিক বিপ্লবেব মহত্তর বস্তুর বীজ বপন করে।

প্রত্যেক ধর্ম পথই মানব জাতিকে সাহায্য করেছে। প্রাচীন গ্রীকোরোমক ধর্মসাধনা মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যের দীপ্তিকে, তার জীবনের প্রসারতা ও সমুচ্চতাকে এক বহুমুখী সার্থকতার আদর্শকে

বর্জিত করেছে। খৃস্টীয় সাধনাকে ভাগবত প্রেমেও সহৃদয়তাকে মানুষের দৃষ্টি পথে কথঞ্চিৎ এনে ধরেছে। বৌদ্ধধর্ম দেখিয়েছে জ্ঞানে কারুণ্যে শুচিতায় কি রকমে পূর্ণতর হয়ে ওঠা যায় তার এক সুমহান পন্থা। ইহুদী ধর্ম আর ইসলাম দেখিয়েছে কর্মের মধ্যেও কি রকমে ধর্মভাব নিয়ে ভগবানে নিষ্ঠা রাখা যায়, কি উদ্দীপনায় তদ্গতচিত্ত হওয়া যায়। আর হিন্দুধর্ম মানুষের সম্মুখে তার বৃহত্তম গভীরতম আধ্যাত্ম সম্ভাবনাকে সব উন্মুক্ত করে ধরেছে। এই সকল দিব্য-দৃষ্টি, যদি পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ধরতে পারত, যদি একে অপরের মধ্যে গিয়ে সম্মিলিত সংযুক্ত হতে পারত তবে এক মহান কার্য সমাধা হত। কিন্তু তর্ক বুদ্ধিগত সঙ্কীর্ণ মতবাদ আর সম্প্রদায়িক অহমিকা অন্তরায় হয়ে আছে।

প্রত্যেক ধর্মই কতকগুলি জীবের উদ্ধার সাধন করেছে কিন্তু আজ অবধি কোন ধর্মই সমগ্র মানব জাতিকেই আধ্যাত্মিক করে তুলতে পারে নাই। কারণ যা দরকার তা অনুষ্ঠান নয়, অনুশাসন নয় তা হল আধ্যাত্মিক আত্মবিকাশের জন্য একটা নিরবচ্ছিন্ন সর্ব ব্যাপক প্রচেষ্টা।

আজ জগতের মধ্যে যে সব পরিবর্তন দেখি—তা আদর্শ হিসাবে আর উদ্দেশ্য হিসাবে হল মানসিক, নৈতিক আর স্থূল ভৌতিক। এখনও আধ্যাত্মিক বিপ্লব তার সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে; তবে ইতোমধ্যে এখানে ওখানে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঢেউ সে তুলে দিয়েছে এ বিপ্লবটি যতদিন না ঘটছে ততদিন অন্যান্য বিপ্লবগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম হবে না। আর সে পর্যন্ত বর্তমান ঘটনার সব রকম ব্যাখ্যা আর ভবিষ্যতের সব রকম পূর্বকল্পনা নিরর্থক। কারণ সেই বিপ্লবের প্রকৃতি, শক্তি ও বাস্তব আবির্ভাবই মানব জাতির আগামী যুগের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করে দেবে।

অরবিন্দের সাধনা তো ব্যক্তি জীবনের মুক্তির জন্য নয়। নয় তার কাম্য এ পৃথিবী হতে মোক্ষলাভ।

তিনি চেয়েছিলেন উর্ধ্বতর লোকের এমন কোন আলো এ জগতে নিয়ে আসতে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে সক্রিয় করতে যা মানব প্রকৃতির মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।

অরবিন্দের বিশ্বাস, এ শক্তির আবির্ভাব যথা সময়ে সম্ভব হবেই। পার্থিব চেতনা যদি অতি মানসিকতাকে ধারণ করতে পারে তাহলে এ যুগেই তো অঘটন ঘটা সম্ভব।

জন বলের প্রয়োজন আছে কিন্তু অমানুষিক সাধনায় আর নিজেদের নিয়োজিত করার প্রয়োজন নেই।

তাইতো অরবিন্দের সাধনা শুধু মাত্র তার নিজের জন্য নয়—সমষ্টিগত মানুষের জন্য।

তিনি সাধনার পথিকৃৎ মাত্র।

পরবর্তীদের চলার পথ সুগম করে দেওয়ার জন্যই এ সাধনা।

"অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে ; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মায়ের বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হন, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারী বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে ব্রহ্মতেজও আছে সেই তেজজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজ কালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম এইভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।"

অবশেষে এল উনিশ শ' সাত চল্লিশের পনেরই আগস্ট।

'ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করবেই' অরবিন্দের এ বিশ্বাস আজ সফল।

স্বাধীনতা দিবসে অরবিন্দ শোনালেন তার বাণী।

১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারতের জন্ম-লগ্ন। এই তো সেইদিন যেদিন পুরাতন যুগের শেষে নতুন যুগের পদক্ষেপ। কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের কাছেই এ দিনটি তাৎপর্যময় তা নয়, এ দিনটি তাৎপর্যময় সমগ্র এশিয়ার কাছে, সমগ্র জগতের কাছেও। কারণ 'নেশন' গোষ্ঠীর মধ্যে আর একটা নূতন নেশন-শক্তির আভির্ভাব ঘটল, ভবিষ্যত সম্ভাবনায় যে নেশন অফুরন্ত। মানব জাতির রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা আধ্যাত্মিক ভবিষ্যত গঠনে এ নেশন নিশ্চয়ই নেবে একটি বৃহৎ ভূমিকা। ব্যাক্তিগত ভাবে আমি অত্যন্ত সুখী, যে দিনটি আমার জন্মদিন হিসেবে আমার কাজে ছিল স্মরণীয়, আমার আদর্শ ও জীবন সাধনা যারা গ্রহণ করেছে তারা যে দিনটিকে উৎসব মুখর করে তোলে, ঠিক সেই দিনটিই আজ বহন করছে একটি বিরাট অর্থ। আমি আধ্যাত্মপন্থী, এ যোগাযোগ তাই আমার কাছে আকস্মিক-ঘটনা বা হঠাৎ-যোগ নয়, বরং যে কাজ লক্ষ্য করে আমি আমার জীবন শুরু করেছিলাম তার পেছনে যে ভগবানের শক্তি ও অনুমোদন ছিল এতো তারই পরিচায়ক, তাঁরই আশীর্বাদ। ভগবৎ-শক্তিই আমাকে প্রতিপদে পরিচালিত করেছে। যে সকল জাগতিক আন্দোলনের পূর্ণ সাফল্য আমি দেখে যাওয়ার জন্য আশা পোষণ করেছি, এক সময় যে গুলো অসম্ভব স্বপ্ন বলেই মনে হত অন্য সকলের কাছে, আজ সেগুলোই পূর্ণ সাফল্যের পথে পৌছাচ্ছে

অন্ততঃ সকল আন্দোলনেরই কাজ শুরু হয়েছে, পৌঁছাচ্ছেও সাফল্যের পথে।

আজকের মহাশুভ উদ্যোগ পর্বে আমার কাছে বাণী চাওয়া হয়েছে। কিন্তু বাণী দেওয়ার মত সম্ভাবনা এখন আমার নেই। তবে শৈশবে যৌবনে অঙ্কুরিত আশা আকাঙ্ক্ষা যা বর্তমানে ফলপ্রসূ হতে চলেছে—সেই ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা আমি শোনাতে পারি।...

আমি চিরকাল বিশ্বাস করেছি, বলেছি, ভারতের অভ্যুত্থান শুধু-মাত্র তার নিজের স্থূল স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়, নয় শুধুমাত্র আপানার প্রসার, মহত্ত্ব, শক্তি সমৃদ্ধিলাভের জন্য, তার অভ্যুত্থান হবে ভগবানের জন্য, জগতের জন্য, সকল মানবজাতির সহায় হবে ভারত, ভারত দেবে নেতৃত্ব।

আমার আশা আকাঙ্ক্ষা গুলোকে তাদের স্বাভাবিক ক্রমানুসারে সাজিয়ে দিচ্ছি।

আমি চেয়েছিলাম এমন এক বিপ্লব যা ভারতের মুক্তি নিয়ে আসবে, ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে ঐক্য।

চেয়েছিলাম, এশিয়ার পুনরভ্যুত্থান, এশিয়ার মুক্তি—মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির জন্য এক সময় এশিয়া যে সুমহান ব্রত উদযাপন শুরু করেছিল আবার গ্রহণ করবে সেই একই ব্রত।

আমি চেয়েছি, মানবের জন্য একটা নূতন, একটা মহত্তর, একটা উজ্জ্বলতর, একটা উন্নততর জীবন ধারা—বাহ্যতঃ এ জীবন ধারা আন্তর্জাতিক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রত্যেক নেশন আপন আপন স্বকীয় জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য রাখবে অক্ষুণ্ণ। কিন্তু সকলেই
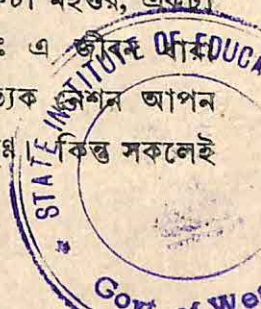
থাকবে এক সূত্রে বাঁধা সকলের উপরে অন্তিমে যে অনিবার্য একতা রয়েছে তাকে লক্ষ্য করেই।

আমি আশা করেছি, ভারত বিশ্বকে দেবে অধ্যাত্মজ্ঞান, দেবে জীবকে আধ্যাত্মিক করে তোলার সাধনার নির্দেশ।

আমার আকাঙ্ক্ষা, উর্দ্ধতর চেতনায় মানুষের উত্তরণ ঘটবে। প্রকৃতির বিবর্তনের একটা নতুন পর্যায়ের আগমনে হ'বে জাগতিক যাবতীয় সমস্যার সমাধান, মানুষ যে বরাবর বিমূঢ় আর ক্ষুব্ধ এ সমস্যায়। মানুষ যে সেদিন থেকেই দেখেছে সর্বাঙ্গ সুন্দর সমাজের চিত্র, দেখেছে স্বপ্ন।

ভারত আজ স্বাধীন, কিন্তু একত্ব লাভ সম্ভব হয়নি, এযে তার দীর্ণ খণ্ডিত স্বাধীনতা। এমনকি এক সময় এমনও মনে হয়েছিল হয়তো বা ভারত ব্রিটিশ অধিকারের অব্যবহিত পূর্বের বিছিন্ন রাষ্ট্ররাজির বিশৃঙ্খলার মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করেছে। তবু সুখের কথা এই সাঙ্ঘাতিক পুনরাবর্তন আর ঘটবে না। অন্ততঃ এমন আশা করা যায়। Constituent Assembly তাদের কর্মব্যবস্থার যে দৃঢ়তা ও সুবুদ্ধির পরিচয় রেখেছেন, তাতে সহজেই অনুমান করা যায় অনুন্নত শ্রেণীর সমস্যার সুসমাধানই হবে, ভাঙ্গন বা খণ্ডন ঘটবে না; কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সেই সুপ্রাচীন ধর্ম বিদ্বেষ এত গাঢ় হয়ে উঠেছে যে মনে হয় দেশকে যেন স্থায়ী ভাবে খণ্ডিত করেছে রাজনীতিক হিসাবেও। তবে আশা করি, জাতীয় মহাসভা আর দেশের মানুষ এই আপাতঃ বাস্তব সত্যকে স্থায়ী বাস্তব বলে গ্রহণ করবে না, দেবে না সাময়িক ব্যবস্থার অধিক মূল্য। কারণ যদি এ ব্যবস্থা স্থায়ী হয় তবে ভারত দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য, বিফল হয়ে যাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা রইবে সর্বকালের জন্যে, নতুন করে বিদেশী আক্রমণের সম্মুখীন ভারতকে

আবার হয়তো বা হতেও পারে। দেশের বিভাগ দূর করতেই হবে-যে কোন উপায়েই হোক না কেন। বিরোধের উগ্রতা হ্রাস পাবে, শান্তির সৌ ভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করবে উভয় পক্ষই, উপলব্ধি করবে একই কর্মে আত্মনিয়োগের সার্থকতা —এমন আশা অমূলক নয়। ঐক্য যে কোন আকারেই আসুক না কেন আসবেই। খণ্ডতাকে যেতে হবে, যাবেই। তা না যদি যায় তাহলে ভারতের ভবিতব্য ক্ষুন্ন হতে বাধ্য—ব্যর্থতাও অসম্ভব নয়। কিন্তু তা ঘটতে দেওয়া হবে না। কারণ তা অভিপ্রেত নয়।

এশিয়া আজ জেগেছে, আজ তার বহুলাংশ স্বাধীন কিংবা স্বাধীন হওয়ার পথে—এশিয়ার যে সকল অংশ এখনও পরাধীন তারাও সমস্ত রকম প্রতিকূলতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্যদিয়েই মুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। যে সামান্য কার্য সমাধা বাকী তাও হবে, তা আজই হোক আর কালই হোক। ভারত তার করণীয় কাজ শুরু করেছে অত্যন্ত নৈপুণ্যতার সঙ্গে। তার এই কর্ম সামর্থ্যই নির্দেশ করে ভারতের ভবিষ্যত সম্ভাবনা, জাতিসংঘের আসরে সে কোন স্থান অধিকার করতে পারে এ তারই সূচক।

শুরু হয়েছে মানবজাতির ঐক্য সাধন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য আরম্ভ অত্যন্ত ত্রুটি বহুল। একটা বাহ্যব্যবস্থা তার হস্তগত হয়েছে সত্য কিন্তু বিপুল বিঘ্নের বিরুদ্ধেই তো তাকে চলতে হ'বে—চলতে হচ্ছে। কিন্তু সে অর্জন করছে অন্তরে বেগ, ইতিহাসের শিক্ষা দিয়ে যদি দিকনির্ণয় করা হয় তাহলে একথা নিঃসন্দেহে ঘোষণা করা করা যায় এ বেগে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবেই, পরিণামে জয়লাভও অবশ্যম্ভাবী।......

অতর্কিত বাধা-বিঘ্ন আসা স্বাভাবিক; কাজের গতি তাতে ব্যাহত হতেও পারে, তাকে ধ্বংস করতেও পারে—কিন্তু তবু ভবিষ্যৎ ফল সুনিশ্চিত। যাই হোক না কেন, প্রকৃতির ধারায়

ঐক্য সাধন অবশ্য প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য অঙ্গ এবং নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ বাণীও করা যায় এর সিদ্ধি সম্পর্কে, সফলতা প্রসঙ্গে। একথা অত্যন্ত সত্য, নেশনের প্রয়োজন সকলের কাজেই কারণ নেশনকে বাদদিয়ে কখনই ক্ষুদ্রতর জাতি নিরাপদে থাকতে পারে না। ভারতবর্ষ যদি খণ্ডিত থাকেই তবে তার নিরাপত্তা সন্দেহাকুল। সকলের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই ভারতের ঐক্য একান্ত অভিপ্রেত। মানুষেরা পঙ্গুতা আর মূঢ় স্বার্থপরতাই তাকে ব্যর্থ করতে পারে—মানুষের এ গুণের বিরুদ্ধে, শোনা যায়, দেবতার প্রচেষ্টা পর্যন্তও ব্যর্থ হতে বাধ্য, কিন্তু প্রকৃতির প্রয়োজন আর ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ জিনিস কখনও দাঁড়াতে পারে না।

জাতীয়তা সার্থকতা লাভ করবেই। তারপর শুধু প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ভাব ও দৃষ্টি গড়ে তোলার, গড়ে তোলার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের।...

নেশনবাদ পরিত্যাগ করবে তার যোদ্ধ মনোভাব। আপনার আপনত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেও এসকল জিনিসকে বরণ করে নিতে পারবে সমস্ত মানব জাতি যেদিন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে একটি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য।

ভারত জগতকে তার আধ্যাত্মিক বিদ্যা দান শুরু করেছে। এ বিদ্যা ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপে, ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকায়।

যুগ দুর্যোগের মধ্যেও মানুষের দৃষ্টি আশা ও ভরসায় ভারতের দিকেই রয়েছে, কেবল শাস্ত্র নয় তার সাধনা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্যও আজ বিশ্ববাসী উন্মুখ।

এর পর আমার ব্যক্তিগত আশা ও আদর্শ।

বিবর্তনের পর্য্যায়ে মানুষ আরও এগিয়ে যাবে। মানুষ উচ্চতর ও চেতনার স্তরে গিয়ে পৌছাবে। চিন্তাবৃত্তির উন্মেষ কাল হতে শুরু করে যে সব সমস্যায় সে বিব্রত তার একটা সমুচিত সমাধান শুরু হবে, ব্যক্তিগত পরমোৎকর্ষের ও সমাজগত সংহতির স্বপ্ন

দেখবে মানুষ। বিবর্তন ক্রিয়ার বাহিরের ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে রইলেও, উৎস হবে ভারতবর্ষ।

ভারতের এই মুক্তি দিবসের মধ্যে আমি এই তৎপর্যই লক্ষ্য করেছি—এ যোগাযোগ কত দিনে সম্ভব, কতদিনে তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে তা নির্ভর করছে এই নূতন ও মুক্ত ভারতবর্ষেরই উপর।

স্বাধীনতা দিবসের এ বাণী ঐতিহাসিক বাণী।

কিন্তু আর কোনদিন শোনা যাবে না অরবিন্দের কোন বাণী। আর কোনদিন এ মনীষা জেগে উঠবে না তার বিপুল বৈভবে।

আমাদের জন্য রইবে শুধুমাত্র তার অমূল্য চিন্তা ধারা। রইবে পথ নির্দেশ।

উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের পাঁচই নভেম্বর।

মহাজীবনের মহাপ্রয়াণ।

কেউ ভাবেনি: এমন অকস্মাৎ মৃত্যু দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি অরবিন্দকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের কাছ হতে।

আজ শোকে বিমূঢ় ভারতবাসী, স্তম্ভিত বিশ্ববাসী।

পণ্ডিচেরী আজ মহাতীর্থ। শোকার্ত মানুষ দেখতে এসেছে শেষ বারের মত মহা ঋষির জড় আবরণ—মরদেহ।

শোকে বিমূঢ়া শ্রীমা।

"হে আমাদের ভগবানের জড় আবরণ, তোমাকে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি, তুমি যে আমাদের জন্য এত করেছে, কষ্ট করেছ, আশা করেছ, সহ্য করেছ, তুমি যে সব কিছু সংকল্প করেছ, চেষ্টা করেছে, তৈরী করেছ, সংসিদ্ধ করেছে আমাদের জন্যে, তোমার সম্মুখে প্রণত আমরা: আর এই প্রার্থনা তোমার কাছে, আমরা

যেন কখন ভুলে না যাই, এক মুহূর্তের জন্যেও, তোমার কাছে সব কিছুর জন্যে কত আমরা ঋণী।”

শ্রীমা আদেশ দিলেন অরবিন্দের মরদেহ সমাধিস্থ করার জন্য।

শেষ হল একটি যুগ।

ভারতের একটি যুগের ইতিহাস আজ এখানে এসে থমকে দাঁড়াল।

কিন্তু না, অরবিন্দকে ভোলা যায় না।

কোন শক্তি নেই যা মুছে দিতে পারে অরবিন্দের নাম মানুষের মনের মণি-কোঠা হতে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমালাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষালাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আজ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন—

তোমাকে প্রণাম জানাই অরবিন্দ।

———

অমিতাদেবীর অন্যান্য বই :

১। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ (২য় মুদ্রণ)
২। বিনয়-বাদল-দীনেশ (২য় মুদ্রণ)
৩। কবি সুকান্ত (২য় মুদ্রণ)
৪। বিদ্রোহী কবি নজরুল
৫। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লচাকী-বাঘাযতীন
৬। ভারত-রত্ন ইন্দির গান্ধী
৭। বিপ্লবী সূর্যসেন
৮। নেতাজী সুভাষচন্দ্র